সেদিন চৈত্র মাস

হুমায়ূন আহমেদ

বাড়ির নাম 'আতর বাড়ি'।

ঢাকা শহরে অদ্ভুত অদ্ভুত নামের অনেক বাড়ি আছে। আতর বাড়িকে কি সেই তালিকায় ফেলা যায়?

গাছপালায় ঘেরা বিশাল দোতলা বাড়ি। চারদিকে উঁচু পাঁচিল বলে দিচ্ছে বাড়ির মালিকের প্রচুর পয়সা। ধনবান ব্যক্তিদের বাড়ির পাঁচিল উঁচু হয়। তাঁরা নিজেদের পাঁচিল দিয়ে আলাদা করে রাখতে পছন্দ করেন। তাঁদের বাড়ির গেট হয় নিশ্ছিদ্র লোহার। সেখানে কোনও ফুটো-ফাটা থাকে না। ফুটোর ভেতর দিয়ে তাঁদের বাড়ির ভেতরের কোনও কিছুই দেখার উপায় নেই।

শফিকুল করিম আতর বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছা করলেই সে বাড়িতে ঢুকতে পারে। ঢুকছে না। সিগারেট ধরিয়েছে, কে জানে ভেতরে হয়তো সিগারেট খাওয়া যাবে না। এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে বাড়ির মালিক মবিনুর রহমান সিগারেটের ধোঁয়া পছন্দ করেন না। অতি ধনবানরা একটা পর্যায়ে এসে ডাক্তারদের নিয়মকানুন মেনে চলেন। সিগারেট ছেড়ে দেন। নিরামিষি হয়ে যান। মর্নিং ওয়াক করেন। বাড়িতে ওয়াকার নামক যন্ত্র থাকে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাঁটা। ধনবানদের বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

একটা সিগারেট শেষ করতে শফিকুল করিমের দুই মিনিট বার সেকেণ্ড লাগে। স্টপওয়াচ দিয়ে হিসেব করা। আজকে মনে হয় সময় বেশি লাগছে। টেনশনের সময় অন্য সবাই সিগারেট দ্রুত টানে। তার বেলায় উল্টোটা হয়— সে সিগারেট আস্তে টানে। সময় বেড়ে যায়। শফিকুল করিমের কাছে মনে হচ্ছে সে দশ পনেরো মিনিট ধরেই সিগারেট টানছে, তারপরেও অর্ধেকের বেশি শেষ হয়নি। মনে হয় তার টেনশন বেশি হচ্ছে। অথচ টেনশনের কোনওই কারণ নেই। মবিনুর রহমান তাকে

http://Doridro.com

শফিক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে গেল

—নিজের গল্প অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভাল লাগে। ঠিক না?

—জ্বি স্যার ঠিক।

—এই জন্যেই গল্প মনে রাখতে বলছি, অন্য কিছু না।

মবিনুর রহমান চেয়ারে পা তুলে গুছিয়ে বসলেন। বাবুলের দিকে তাকিয়ে গল্প শুরু করলেন।

সত্যজিৎ রায়ের একটা ছবি আছে না, পথের পাঁচালী নাম। আমার বিয়ে হয়েছিল অবিকল পথের পাঁচালী স্টাইলে।

শফিক বিড়বিড় করে বলল, পথের পাঁচালীতে কোনও বিয়ে কি হয়েছিল?

—অবশ্যই হয়েছিল। নায়ক তার বন্ধুর সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে, সেখানে বিয়ে হল।

—ছবিটার নাম সার অপুর সংসার। বিভূতিভূষণের কাহিনী।

—কার কাহিনী বলতে পারব না। সতজিতের ছবি সেটা মনে আছে। টিভিতে দেখিয়েছিল। শফিক শোনো, ছবির স্টাইলে আমার বিয়ে হয়।

শফিক চুপ করে রইল। তাঁকে মাথা ঘুরিয়ে গল্প শুনতে হচ্ছে। চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলে ভাল হত। সেটা করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না।

ছবিতে ছিল বন্ধুর মামাতো বোন কিংবা খালাতো বোন আর আমার বেলায় ছিল বন্ধুর আপন বোন। তবে ছবিতে বিয়ের পর ঘর সংসার করে, আর আমার বেলায় রাত একটায় বিয়ে হয়ে পরদিন সকালে তালাক হয়ে যায়। খুবই ইন্টারেস্টিং স্টোরি। মেয়েটার নাম লায়লা। লায়লা একটা আরবী নাম। নামের অর্থ হল রাত্রি। জানো নিশ্চয়ই?

—জ্বি স্যার জানি। আলিফ লায়লা— আরব্য রজনী।

—আমার বিয়ের গল্পটাও আরব্য রজনী টাইপ। আমি গল্প উপন্যাস লিখতে পারলে নিজেই একটা গল্প লিখে ফেলতাম। তোমার কি গল্প টল্প লেখার অভ্যাস আছে?

—জ্বি না স্যার।

—তোমার পরিচিত কোনও লেখক আছে? অন্যের প্লট নিয়ে গল্প লিখবেন? আমার কাছে অনেক গল্পের প্লট আছে।

—আমার তেমন কেউ পরিচিত নেই স্যার।

—অসুবিধা নাই। এখন পরিচয় নাই, ভবিষ্যতে হয়ত কারো সঙ্গে পরিচয় হবে তাই না?

—জ্বি সার।

—তুমি নিজেও লিখে ফেলতে পারো। আমার স্ত্রীর নাম লায়লা, এটা লিখে রাখলে সুবিধা হবে, নাম ভুলবে না।

শফিক কিছু বলল না। বুড়োর কথাবার্তায় সে তেমন কোনও আগামাথা পাচ্ছে না।

—বিয়ের গল্পটা তাহলে শোনো। বন্ধুর সঙ্গে তার গ্রামের বাড়িতে গেছি। বরযাত্রী আসবে ট্রেনে করে। বিকাল পাঁচটায় ট্রেন। বিকাল চারটা

http://Doridro.com

থেকে দলবল নিয়ে স্টেশনে বসে আছি। ট্রেন এল আধাঘন্টা লেট করে। আমরা স্টেশনে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে গিয়েছিলাম। বর নামবে, ব্যান্ডপার্টি বাজনা শুরু করবে। বর নামল না। সতজিৎবাবুর ছবির সাথে এইখানে একটু গণ্ডগোল। তাঁর ছবিতে বর এসেছিল নৌকায়।

—স্যার নৌকায় না, পালকিতে।

—ও আচ্ছা, মনে হয় পালকিতে। বর ছিল পাগল। আমার ক্ষেত্রে বর আসেইনি। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। কান্নাকাটির কিছু ছিল না। মুসলমানি নিয়মে বিয়ের তারিখে বিয়ে না হলে কিছু যায় আসে না। হিন্দু নিয়মে বোধ হয় বিরাট সমস্যা হয়। লায়লার বাবা মহা হৈ চৈ শুরু করলেন, আজকেই মেয়ের বিয়ে দেব। যদি আজ রাতের মধ্যে বিয়ে দিতে না পারি তাহলে কাঁচা গু খাই। এই সব আজেবাজে কথা। গ্রামের মানুষরা তাল দিতে খুব ওস্তাদ। তারা তাল দিতে লাগল। রাত একটা দশ মিনিটে বিশ হাজার টাকা দেন মোহরে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল।

টেনশনে আমার হয়ে গেল শরীর খারাপ। মাথা সোজা রাখতে পারি না। প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা। লায়লাদের কোনও এক আত্মীয় এর মধে আমাকে দুই ডোজ হোমিওপ্যাথির কী ওষুধ খাওয়াল। শুরু হল বমি। এক সময় মনে হল মারাই যাব। ভোর রাতে মনে হল শরীর সামান্য সুস্থ হয়েছে। গরম পানি দিয়ে গোসল করলাম। এক কাপ আদা চা আর অর্ধেকটা বিসকিট খেয়ে একটু ভাল বোধ করছি। তখন শুনি হৈ চৈ— বরযাত্রী চলে এসেছে। ওরা ভুল করে দুই স্টেশন আগে নেমে গিয়েছিল। সেখান থেকে বাস ভাড়া করে এসেছে। কী রকম ঝামেলা হল আন্দাজ করতে পারো?

—জ্বি স্যার পারছি।

—কী হচ্ছে না হচ্ছে আমি অবশ্যি কিছুই জানি না। এক সময় ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। সকালে আমার বন্ধু এসে আমাকে ডেকে তুলল, নানান কথা, নানান ধানাইপানাই। মূল বিষয়, বিয়ে শুধু কাগজপত্রে হয়েছে। ম্যারেজ কনজুমেট হয়নি। এই বিয়ে ভেঙে দেওয়া নাকি কোনও ব্যাপার না। ওই পার্টি তাই চায়। এইসব হাবিজাবি কথা।

তারাই কাজি ডেকে আনল। তালাক হয়ে গেল। তালাক হয়ে গেল সকাল আটটা দশে। এইখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ করো। বিয়ে হয়েছিল একটা দশে। তালাক হবার পর ঘড়ি দেখলাম, তখন বাজে আটটা দশ। আটটা দশ না হয়ে আটটা পনের কিংবা বিশও হতে পারত। তা কিন্তু হয়নি। দশ মিনিট একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক বলেছি কিনা বলো?

—জ্বি স্যার।

—এরপর থেকেই সময়ের ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। তোমাকে এই কারণেই বার বার কয়টা বাজে জিজ্ঞেস করি। আমার বিয়ের গল্পটা কেমন লাগল?

—ভাল।

—কোন তারিখে বিয়ে হয়েছিল এটা তোমাকে বলতে পারছি না। তারিখটা মনে নেই। মনে অবশ্যই পড়বে, তখন তোমাকে বলব। তুমি খাতায় নোট করে রেখো।

—জ্বি স্যার রাখব।

—লায়লা এখন নারায়ণগঞ্জে থাকে। একটাই মেয়ে। মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে। তবে এখনও বিয়ে হয়নি। আমার সঙ্গে অবশ্যি তাদের কোনও যোগাযোগ নেই। তবে আমি খোঁজখবর রাখি। মাঝে-মধ্যে এটা সেটা উপহার পাঠাই। গত বৎসর এক ঝুড়ি গোপালভোগ আম পাঠিয়েছিলাম। তোমার আগে যে ম্যানেজার ছিল সে নিয়ে গিয়েছিল। তার কাছে শুনেছি, তারা তাকে যত্ন করেছে। চা কেক খাইয়েছে। লায়লা আমার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। শরীর কেমন কী। এইসব। ভাবছি এই বৎসরও কিছু আম পাঠাব। তুমি দিয়ে আসবে। পারবে না?

—জ্বি স্যার পারব।

—ক্যাশিয়ার সোবাহানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দুই ঝুড়ি আম কিনবে। গোপালভোগ আর হিমসাগর। দেখেশুনে কিনবে, পারবে না?

—পারব।

—বাজারে আম কি উঠেছে?

—জ্বি উঠেছে।

—দিনাজপুরের লিচু কি পাওয়া যায়?

—পাওয়া যায়।

—শ'দুই লিচুও নিয়ে যাবে।

—স্যার আজ যাব?

—আজ যাবার দরকার নাই। কোনও এক ছুটির দিনে যাবে। লায়লা শুনেছি কোনও এক স্কুলে মাস্টারি করে। এমন দিনে যাওয়া উচিত যেন সে বাসায় থাকে। বুঝেছ? অন্য কারও হাতে পাঠালে বুঝতেও পারবে না কে পাঠিয়েছে, কী সমাচার। তাই না?

—জ্বি স্যার।

—আচ্ছা ঠিক আছে এখন যাও। আজ তোমার ডাল রান্না করার কথা। ভুলে যেও না। কী ভাবে রাঁধতে হয় শিখিয়ে দিয়েছিলাম। মনে আছে না?

—মনে আছে।

—আমি রান্নাবান্না সব এতিমখানার বাবুর্চির কাছে শিখেছি। বাবুর্চির নাম সিদ্দিক। সিদ্দিক ভাই রাঁধতেন, আমি পাশে বসে থাকতাম। রান্নার সময় নানান গল্পগুজব করতেন। ছড়া বলতেন। সবই রান্না বিষয়ক। একটা তোমাকে বলি শোনো। চিংড়ি মাছ বিষয়ক—

ইচা
কাটতে মিছা
ধুইতে নাই
খাইতে গেলে আবার পাই।

—ঘটনা বুঝতে পারছ?

—জ্বি না স্যার।

—ইচা হল চিংড়ি মাছ। কাটতে মিছা মানে কাটা অনর্থক। ধুইতে নাই মানে ধোবার সময় মাছ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। আবার খেতে গেলে পাওয়া যাবে। বুঝেছ?

—জ্বি স্যার।

—এখন নীচে গিয়ে খোঁজ নাও, আমজাদ এই পর্যন্ত মোট কতবার উঠবোস করেছে।

শফিক দোতলা থেকে একতলায় নেমে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে ভাল লাগছে। স্বস্তিবোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে বড় সাহেবের সামনে এতক্ষণ সে ত্রিশ কেজি বোঝা মাথায় নিয়ে চেয়ারে বসে ছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামার আগে বোঝাটা চেয়ারে নামিয়ে এসেছে। আবার যখন তিনি ডেকে পাঠাবেন, বোঝা মাথায় নিয়ে তাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করতে হবে। কোনও মানে হয়?

শফিক একতলায় নেমে প্রথম যে কাজটি করল, তা হল, সিগারেট ধরালো। প্রথম সিগারেট অতি দ্রুত শেষ করে চায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় সিগারেট। একতলায় কর্মচারীদের যে রান্নাঘর আছে, সেখানে চুলায় চায়ের পানি সব সময় ফুটছে। টি ব্যাগ চিনি দুধ সবই রাখা আছে। তা বানানোর আলাদা লোক নেই, নিজের হাতে বানাতে হবে।

শফিক চায়ের কাপ নিয়ে একতলার পেছনে বারান্দায় চলে এল। মেজাজ খুব খারাপ লাগছে। বড় সাহেব তাকে কাজ দেবেন বলেছেন। কাজটা কী এখনও জানা যায়নি। মনে হয় তার পরীক্ষা শেষ হয়নি।

—শফিক সাহেব চা খাচ্ছেন নাকি?

শফিক ভ্রু কুঁচকে তাকাল। ক্যাশিয়ার সাহেব তার দিকে আসছে। তার কি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ানো উচিত? পদাধিকারে ক্যাশিয়ার তার চেয়ে বড় না ছোট? কোনও কিছুই সে জানে না। সে এমন এক চাকরি করছে, যে- চাকরিতে তার পজিশান কী, সে কিছুই জানে না। শফিক উঠে দাঁড়াল না, তবে উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গি করল।

সোবাহান সাহেব যন্ত্রের মতো বললেন, আপনার জন্যে একটা

http://Doridro.com

মোবাইল টেলিফোন স্যাংশান হয়েছে। সাইন করে নিয়ে যাবেন। কোনও কারণে চাকরি টার্মিনেট হলে কিংবা আপনি স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিলে ,সেইটা অফিসে দিয়ে যাবেন।

শফিক হাসি মুখে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেও মনে মনে বলল, "তোর ওই সেট তুই... দিয়ে বসে থাক।" অতি কুৎসিত এই বাক্য তার মাথায় আসচে কেন সে বুঝতে পারছে না। সোবাহান সাহেব মানুষটার চেহারা ভদ্র। কথাবার্তা ভাল। তাকে দেখে মাথায় গালাগালি আসার কথা না।

—শফিক সাহেব চাকরি কেমন লাগছে?

—বুঝতে পারছি না কেমন লাগছে।

—প্রথম কয়েক দিন মন বসবে না, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।

শফিক বলল, প্রথম কতদিন মন বসবে না?

সোবাহান সাহেব বললেন, এটা একটা কথার কথা বললাম। স্যারের এখানে কাজকর্ম কিছুই নাই, এইটাই সমস্যা। স্যার যেমন কিছু করেন না, দিনরাত শুয়ে বসে থাকেন, আমাদেরও তাই করতে হয়। মানুষ তো কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। ঠিক বলেছি না?

—ঠিক বলেছেন।

—গরুকে যেমন সারাদিন ঘাস খেতে হয়, মানুষকেও সে রকম সারাদিনই কিছু না কিছু করতে হয়। আমাদের এখানে খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। আপনার ইচ্ছা হলে খেলতে আসবেন।

—কী খেলা?

সোবাহান সাহেব শফিকের পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ক্যারাম আছে দাবা আছে। রাতে নাইন কার্ড খেলা হয়। নাইন কার্ড জানেন?

—না।

—ভেরি ইজি। অল্প স্টেকে খেলা হয়। দশ মিনিট খেলা দেখলে শিখে ফেলবেন। তবে আপনি তো রাতে থাকেন না। রাতে থাকলে মজা পেতেন।

শফিক বলল, চা খাবেন? আপনার জন্যে চা নিয়ে আসব? আমি আরেক কাপ খাব, এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি।

—না চা খাব না। আপনার মতো ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খাওয়ার অভ্যাস আমার নাই।

শফিক চা এনে আবার নিজের জায়গায় বসল, তার ক্ষীণ আশা ছিল ফিরে এসে দেখবে সোবাহান সাহেব চলে গেছেন। অকারণ কথাবার্তা শুনতে ভাল লাগছে না। এই লোকের অভ্যাস মনে হয়, অকারণে কথা বলা।

সোবাহান সাহেব ঝুঁকে এসে বললেন, আপনি কি দুধ-চা খান?

—জ্বি।

—দুধ-চায়ের চেয়ে রঙ-চা ভাল। কনডেন্স মিল্কের চা স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ। কনডেন্স মিল্কের প্রধান ইনগ্রেডিয়েন্ট পামঅয়েল। শরীরের জন্যে বিষ বলতে পারেন।

শফিক চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, আমার কাজটা ঠিক কী বলতে পারেন?

সোবাহান সাহেব বললেন, আসবেন যাবেন চা খাবেন এইতো কাজ। এর বেশি কিছু না। স্যার অবসর নিয়েছেন। স্যারের সঙ্গে আমরা সবাই অবসরে। কর্তা যান বঙ্গে আমরা যাই সঙ্গে।

—উনি কোথাও বের হন না?

—সপ্তাহে একদিন ওনার পীর সাহেবের কাছে যান। বুধবার রাতে।

—ওনার পীর আছে না-কি?

—সব পয়সাওয়ালা মানুষের একজন পীর ফকির আছে। রাস্তার কোনও ভিক্ষুককে শুনবেন না সে পীরের মুরিদ। যে কোনও কোটিপতির কাছে যান, শুনবেন তিনি পীরের মুরিদ।

—স্যার কি কোটিপতি?

—কোটি টাকা এখন কোন টাকাই না। স্যারের যে টাকা ব্যাংকে জমা আছে তার ইন্টারেস্টই আসে কয়েক কোটি। ওনার টাকা নিয়ে আলাপ করে আমাদের কোনও লাভ আছে? আমাদের লাভ নাই। আমরা গরুর লেজ। মাছি তাড়ায়ে তাড়ায়ে জীবন শেষ। এই লোক মানুষ হয়েছে এতিমখানায়। কে তার বাপ কে তার মা কিছুই জানে না। বিশ্বাস হয়?

শফিক চুপ করে রইল। সোবাহান সাহেব বললেন, ওনার টাকা পয়সার হিসাব করে দুইজন চার্টার্ড একাউন্টেট। চারজন ক্যাশিয়ার। কী অবিশ্বাস্য কথা।

—আপনি কি চারজন ক্যাশিয়ারের একজন?

—আরে দুর দুর। আমি হলাম গুহ্যদ্বারের ক্যাশিয়ার। আমি এইখানকার খরচের হিসাব রাখি। আসল লোকজন বসে মতিঝিলে হেড অফিসে। আপনার বেতন হবে আমার এখান থেকে। ভাল কথা চাকরির শুরুর প্রথম মাসের বেতন এ্যাডভান্স দেওয়া হয়। এটা স্যারের নিয়ম। এই টাকা মাসে মাসে কেটে রাখা হয়। আপনি মনে করে আজ যাওয়ার সময় বেতন নিয়ে যাবেন।

শফিক বিস্মিত হয়ে বলল, পুরো বেতন?

—অবশ্যই। এখানে চাকরির মজা আছে। কাজকর্ম কিছু নাই, এইটাই সমস্যা। ভাই অমি উঠি। আমজাদ সাহেবের খবর নিই।

—ওনার কী হয়েছে?

—বমি টমি করে একাকার। এখন শুয়ে আছেন। মাথায় পানি দিচ্ছে। মনে হয় ডাক্তার ডাকা দরকার।

—সব মিলিয়ে কতবার উঠবোস হয়েছে? স্যার জানতে চেয়েছেন, এই জন্যে জিজ্ঞাস করছি।

—এগজাক্ট ফিগার আপনাকে জেনে বলছি। সতেরোশ'র উপর হয়েছে। ওনার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

—জ্বি না।

—একবার দেখা করবেন। লোক কিন্তু ভাল। আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। এখন আপনার ঘরেই শুয়ে আছেন। এই ঘরটা তাঁরই ছিল। চাকরি চলে যাওয়ার পর আপনাকে দেওয়া হয়েছে।

ঘর অন্ধকার। দুটা জানালার পর্দা টানা। আমজাদ আলি লম্বালম্বি হয়ে শুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। মাথা ভেজা। মাথায় তোয়ালে জড়ানো। কিছুক্ষণ আগেই মাথায় পানি দেওয়া বন্ধ হয়েছে। পানির বালতি এখনও সরানো হয়নি। শফিকের পায়ের শব্দে তিনি চোখ মেললেন। ফ্যাসফ্যাস গলায় বললেন, কে?

—আমার নাম শফিক। শফিকুল করিম।

—ভাই সাহেব আপনাকে চিনেছি। আপনি স্যারের নতুন ম্যানেজার। ভাল আছেন?

—জ্বি ভাল আছি।

—আমার অবস্থা কাহিল। বমি করে বারান্দা ভাসায়ে ফেলেছি। ভাই সাহেব বসেন, দাঁড়ায়ে আছেন কেন?

শফিক বসল। আমজাদ আলি বললেন, আপনার ঘর দখল করে বসে আছি, কিছু মনে নিবেন না।

—কোনও অসুবিধা নাই। আপনার কি জ্বর? শরীর কাঁপছে।

—শীত শীত লাগছে। জ্বর কিনা বুঝতে পারছি না।

—গায়ের উপর একটা চাদর কি দিয়ে দেব?

আমজাদ আলি ব্যাকুল হয়ে বললেন, চাদর টাদর কিচ্ছু আপনাকে দিতে হবে না। কাউকে ডাক দিয়ে বলেন দিয়ে দিবে।

শফিক তাঁর কপালে হাত দিল। জ্বর ভালই আছে।

মবিনুর রহমান তাঁর শোবার ঘরে। ফুট রেস্টে পা তুলে গভীর মনোযোগে টিভি দেখছেন। টিভি দেখছেন বলা ঠিক হবে না, টিভিতে ছবি দেখছেন। সাউন্ড অফ করা। হিন্দি কোনও সিনেমা হচ্ছে। পাত্র পাত্রীরা সবাই দীর্ঘ ডায়লগ বলছে। সবার চোখেই পানি। মবিনুর রহমানকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি পাত্র-পাত্রীদের ঠোঁটে নাড়া দেখে ডায়লগ ধরার চেষ্টা করছেন। তিনি টিভি থেকে চোখ না সরিয়ে ডাকলেন, বাবুল।

শফিক জ্বি স্যার বলে ঘরে ঢুকল।

http://Doridro.com

তিনি তাঁর দিকে তাকালেন না। সিনেমায় যে দৃশ্যটা চলছে সেটা শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করলেন।

শফিক বলল, স্যার কিছু লাগবে?

তিনি হালকা গলায় বললেন, তোমার হাত কি পরিষ্কার আছে?

—জ্বি স্যার পরিষ্কার।

—পরিষ্কার থাকলেও একটা কাজ করো। বাথরুমে যাও, সাবান দিয়ে হাত ভাল করে ধুয়ে এসে আমার পায়ে ক্রিম লাগিয়ে দাও। আমার সামান্য ডায়াবেটিসের মতো আছে। ডায়াবেটিসে পায়ের যত্ন নিতে হয়। তুমি যেটা করবে সেটা হল— হালকা করে ম্যাসাজ করবে। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ক্রিম দেবে।

শফিক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তার কী করা উচিত সে বুঝতে পারছে না। ইংরেজি সাহিত্যে তার এম এ ডিগ্রি আছে। ভাইভা পরীক্ষায় এক্সটারনাল এগজামিনার বললেন, আমি একজন বিখ্যাত কবির নিজের লেখা এপিটাফের দুটা লাইন বলব। তুমি যদি কবির নাম বলতে পারো তাহলে তোমাকে ভাল নাম্বার দেব। এমনিতেও তুমি ভাল করেছ,তারপরেও সুন্দর সুযোগ পেলে। দেখি সুযোগটা কাজে লাগাতে পার কি না

"I would have written of me on my stone
I had a lovers quarrel with the world."

এই লাইন দুটা কোন কবির লেখা?

শফিক বলল, রবার্ট ফ্রস্ট।

ভাইভায় সে সত্তর পারসেন্ট নম্বর পেয়েছিল। থিওরি আর একটু ভাল করলে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যেত। সে মাস্টারি করত ইউনিভার্সিটিতে। ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য পড়াতো। এসথেটিকস শেখাতো। তাদের সঙ্গে একটি মেয়েই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল, সে ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেছে।

মবিনুর রহমান তাঁর ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তিনি মনে হয় কিছু বোঝার চেষ্টা করছেন। শফিকের কাছে এখন তাঁকে তার এম এ পরীক্ষার ভাইভা বোর্ডের চেয়ারম্যানের মতো লাগছে। যিনি কখনও কাউকে কোনও প্রশ্ন করেননি। যার একমাত্র কাজ ছিল ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে থাকা।

—বাবুল?

—জ্বি স্যার।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমার পায়ে ক্রিম মাখিয়ে দিতে তোমার কিছু আপত্তি আছে। তোমার বাবার পায়ে তুমি কখনও হাত বুলিয়ে দাওনি?

—জ্বি না স্যার।

—দাওনি কেন?

—বাবা কারও সেবা নিতে পছন্দ করেন না।

—কেন করেন না?

—জানি না স্যার।

—তিনি কি তোমার সঙ্গে থাকেন?

—তিনি একটা হোটেলে রুম নিয়ে থাকেন।

—তার জন্যে তাঁকে মাসে কত ভাড়া দিতে হয়?

—তাঁকে কোনও ভাড়া দিতে হয় না। হোটেলের মালিক তাঁর ছাত্র। আমার বাবা স্কুল মাস্টার ছিলেন। হোটেলে বাস করার সামর্থ্য তাঁর নেই।

মবিনুর রহমান তাঁর দৃষ্টি আবারও টিভির দিকে ফেরালেন। আরও তিনি দুলতে শুরু করেছেন। হঠাৎ দুলুনি বন্ধ করে শফিকের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, তোমার বাবা কারও সেবা যে নেন না তার কারণ মনে হয় আমি বের করতে পেরেছি। তিনি সেবা নেন না কারণ সেবা নিলে তার মূল্য দিতে হয়। ওনার মূল্য দেবার সামর্থ্য নেই। আমার যেহেতু সামর্থ্য আছে আমি সেবা নেই এবং সেবা নিতে আমার খারাপ লাগে না। আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে তোমার কেন খারাপ লাগছে আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি আমার চাকরিটা করতে চাচ্ছ না?

—চাচ্ছি স্যার। আমি খুবই খারাপ অবস্থায় আছি।

—যাও বাথরুম থেকে ক্রিম নিয়ে এসো।

মবিনুর রহমান চোখ বন্ধ করে আছেন। শফিক তাঁর সামনে মাথা নিচু করে বসে আছে। মবিনুর রহমান তাঁর পা এগিয়ে দিয়েছেন। শফিক পায়ে ক্রিম ঘসছে। ক্রিমের গন্ধ তীব্র। শফিকের মাথা ঝিমঝিম করছে। শরীর গুলচ্ছে।

—শফিক।

—জ্বি স্যার।

—লায়লাকে মনে আছে?

—মনে আছে, ওনার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে আপনার বিয়ে হয়েছিল।

—তোমার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হোক—কখন বিয়ে হয়েছিল। কখন ভাঙলো?

—রাত একটা দশে বিয়ে হয়েছিল, ভোর আটটা দশে বিয়ে ভেঙেছে।

—তোমার স্মৃতিশক্তি ভাল। এখন মনে হচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে কাজ করতে পারবে। কী কাজ শুনতে চাও?

—স্যার বলুন।

—তোমার একমাত্র কাজ লায়লার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। তার আস্থাভাজন হওয়া। আমি এতিমখানায় বড় হয়েছি তুমি জান না?

—জানি। আপনি বলেছেন।

—আমার নিকটজন বলতে একজনই—লায়লা। তার প্রতি যদি প্রবল দুর্বলতা বোধ করি সেটা নিশ্চয়ই দোষের না। এমনও তো হতে পারে দেখা গেল আমার মৃত্যুর পর আমি সব কিছুই তাকে দিয়ে গিয়েছি। হতে পারে না?

—জ্বি স্যার।

—কাজেই লায়লা ভরসা করতে পারে, এমন কিছু লোকজনের সঙ্গে আগে থেকেই তার পরিচয় থাকা উচিত। তুমি তাদের একজন। তুমি কখনওই মনে করবে না যে, আমি হুট করে তোমাকে নিয়েছি। অনেক চিন্তাভাবনা করেই তোমাকে নেওয়া হয়েছে।

মবিনুর রহমান এখন চোখ মেলেছেন। তাকিয়ে আছেন শফিকের দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে আগের তীক্ষ্ণ ভাবটা নেই। তিনি হালকা গলায় বললেন, আমি ক্যাশিয়ার সোবাহানকে বলে দিচ্ছি, তোমাকে যেন একটা সার্বক্ষণিক গাড়ি দেওয়া হয়। হুটহাট করে তোমাকে নারায়ণগঞ্জ যেতে হতে পারে।

সোবাহান সাহেব খুবই অবাক হয়ে শফিকের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন তিনি শফিককে চেনেন না। শফিক অচেনা কেউ। শফিক বলল, কিছু বলবেন?

সোবাহান সাহেব নিচু গলায় বললেন, বড় সাহেব আপনার জন্যে একটা ফুল টাইম গাড়ি স্যাংশন করেছেন।

—ও আচ্ছা।

—আপনি জিপগাড়িটা নিন। গাড়ি পুরনো হলেও ভাল। ড্রাইভারের নাম রঞ্জু। লোক ভাল। গাড়িতে লগবুক আছে। কোথায় যান না যান একটু লিখে রাখবেন। তেলের হিসাবের জন্যে, অন্য কিছু না। গাড়ি আপনার বাসায় রাতে থাকবে।

শফিক বলল, আমি দরিদ্র মানুষ। গাড়ি রাখার গ্যারেজ নেই।

গ্যারেজ লাগবে না। বাসার সামনে গাড়ি রেখে রঞ্জু গাড়িতে ঘুমবে। স্যার ফুলটাইম গাড়ি দিতে বলেছেন। গাড়ি ফুলটাইম থাকবে। এইসব বিষয়ে স্যারের নিয়মকানুন কঠিন। এক কাপ চা আমার সঙ্গে খাবেন?

—না।

—আসুন না, দুই ভাই এক সঙ্গে চা খাব। আপনার ভাগ্য খুবই ভাল। স্যার আপনাকে পছন্দ করেছেন।

—ফুল টাইম গাড়ি দিয়েছেন এই জন্যে বলছেন?

—জ্বি না এই জন্যে না। আপনার বেতনও বাড়ানো হয়েছে। পনেরো হাজার করা হয়েছে। আগারগাঁয়ে আমাদের যে

http://Doridro.com

তাদেরকে ফ্ল্যাট দিতে বলেছেন।

সোবাহান সাহেব শফিকের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখ চকচক করছে।

শফিক বাসায় ফিরল রাত আটটার দিকে। রিকশায় আসতে হয়নি গাড়ি নিয়ে এসেছে। আজও সে খালি হাতে আসেনি। আধা কেজি রসমালাই নিয়ে এসেছে। নিশোর রসমালাই খুব পছন্দ।

মীরা আনন্দিত গলায় বলল, আজ দেখি সকাল সকাল চলে এসেছ?

শফিক বলল, সকাল সকাল এসে কোনও সমস্যা তো তৈরি করিনি। নাকি কোন সমস্যা তৈরি করেছি?

মীরা বলল, এ রকম রাগী রাগী গলায় কথা বলছ কেন? আমি কথার কথা বলেছি, রাত আটটা এমন কোনও সকালও না। যারা অফিস করে দশটা-পাঁচটা করে। তোমার মতো ভোর সাতটায় গিয়ে রাত দশটায় ফেরে না।

—এত কথা বলছ কেন? হড়বড় হড়বড় করেই যাচ্ছ। নিশো কোথায়?

—তার ছোট মামা এসে নিয়ে গেছে।

—কেন?

—জলিলের বড় মেয়ের জন্মদিনে গেছে।

—রাতে ফিরবে না?

—না।

—তুমি খুব ভাল করে জানো, নিশো রাতে বাইরে থাকবে, এটা আমার খুবই অপছন্দ।

—নিশো খুব যেতে চাচ্ছিল।

—যেতে চাইলেই যেতে দিতে হবে?

মীরা চুপ করে রইল। মানুষটা হঠাৎ কেন এত রাগ করছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছে। মীরা বলল, তুমি কি এখন খাবে, না দেরি হবে? দেরি হলে চা করে দিই।

—আমি রাতে কিছু খাব না।

—কেন?

—খিধে নেই।

—কাঁঠালের বিচি দিয়ে শুটকি মাছ রান্না করেছিলাম।

—হাতির বিচি দিয়ে শুটকি মাছ রান্না করলেও খাব না।

—এইসব কী ধরনের কথা?

—শুনে অপমান লাগছে? আমার সঙ্গে বাস করলে এই ধরনের অপমানসূচক কথা শুনতে হবে। শুনতে যদি ভাল না লাগে এমন জায়গায় চলে যাও যেখানে এ ধরনের কথা শুনবে না।

—সেই জায়গাটা কোথায়?

—কোথায় তুমি খুঁজে বের করো। তোমার মঞ্জু মামাকে জিজ্ঞেস করো।

—ওনার কথা আনলে কেন?

—ইচ্ছা হয়েছে এনেছি। যতবার ইচ্ছা হবে আনব। এখন সামনে থেকে যাও।

মীরা শোবার ঘরে ঢুকে গেল। তার মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। সে ঠিক করে রেখেছিল নিশোর বাবা অফিস থেকে ফেরার পর তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জলিলের ঝিগাতলার বাসায় নিয়ে যাবে। রাতটা সেখানে থাকবে। শফিক খুব আপত্তি করবে বলেও তার মনে হয়নি। মেয়ের টানে যেতে রাজি হবে। জন্মদিনের ভাল খাবার আছে। মানুষটা ভাল খাবার

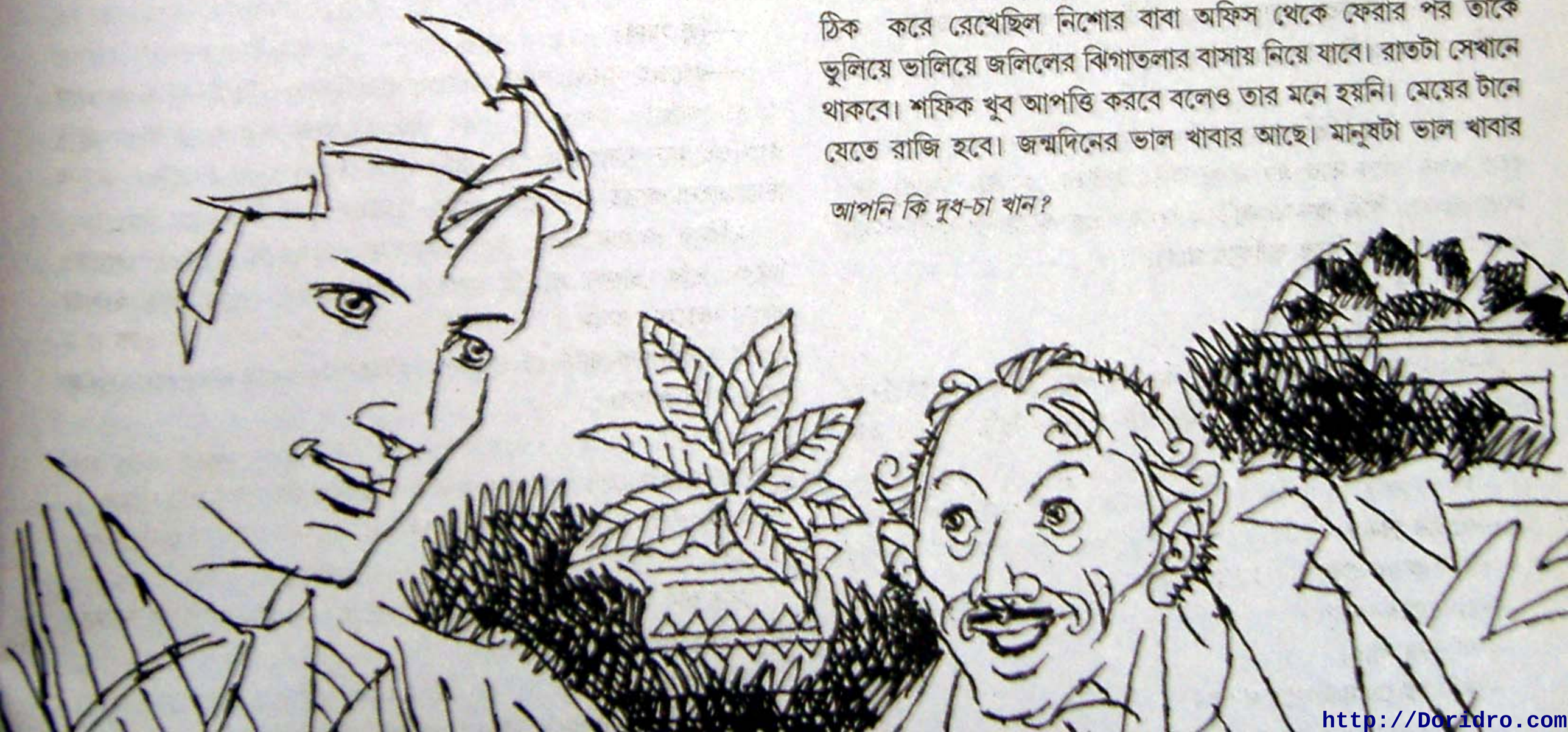

http://Doridro.com

পছন্দ করে। আর যেতে রাজি না হলেও তাদের সময়টা খারাপ কাটবে না। বিয়ের প্রথম দিকের মতো শুধু তারা দুজন।

শফিক হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে সিগারেট টানছে। শোবার ঘরের দরজা খোলা থাকায় মীরা খাটে বসে তাকে দেখতে পাচ্ছে। সে এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। শফিকের রাগ ভাঙানোর চেষ্টা আর একবার করে দেখবে? মানুষটা কী কারণে রাগ করে আছে সেটা জানতে পারলে চেষ্টাটা সহজ হত। সে চায়ের সঙ্গে সিগারেট খেতে পছন্দ করে। এক কাপ চা নিয়ে তার কাছে যাওয়া যায়। এতে তার রাগ না কমলেও নিশ্চয়ই বাড়বে না। চুলায় কেটলি বসানো, পানি ফুটছে, চা বানানো কোনও ব্যাপার না। কথা হচ্ছে সে এখন যাবে, না আর একটু পরে যাবে? একটু পরে যাওয়াই বোধ হয় ভাল। সময় যত যাবে রাগ তত কমবে। আবার উল্টোটাও হতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাগ বাড়তেও পারে। মীরা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘরের দিকে রওনা হল।

—নাও চা নাও।

শফিক হাত বাড়িয়ে চা নিল। মীরা বলল, গোসল করবে? বাথরুমে পানি আছে।

শফিক বলল, আরেকটু পরে।

—চায়ে চিনি কম হয়েছে?

—না চিনি ঠিক আছে।

—আমি কি তোমার পাশে বসব?

—বসতে চাইলে বসো। অনুমতি নেবার কী আছে?

—তুমি যে চাকরি পেয়েছ—বাবা-মাকে খবরটা তো এখনও দাওনি। ওনারা খুব খুশি হবেন।

—খুশি হবার কিছু নাই। খুশি যত কম হওয়া যায় ততই ভাল।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে রেগে আছ। পাশে বসার ভরসা পাচ্ছি না।

শফিক জবাব দিল না। মীরা পাশের চেয়ারে বসল। কথা বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। চুপচাপ বসে থাকাটাও ঠিক হচ্ছে না। মীরা বলল, আজ কিরকম গরম পড়েছে দেখেছ? কাল ছিল ঠাণ্ডা, চাদর গায়ে ঘুমতে হয়েছে। আজ আবার গরম। তোমার অফিসে নিশ্চয়ই এসি আছে তাই না?

শফিক জবাব দিল না।

মীরা বলল, ওরা যে বলেছে তোমাকে একটা মোবাইল টেলিফোন দেবে, কবে দেবে?

—দিয়েছে।

মীরা আনন্দিত গলায় বলল, এই খবরটা দাওনি কেন? আচ্ছা এই মোবাইলে কি টি এন্ড টি লাইনও ধরা যায়? ধরা গেলে এক্ষুনি নিশোর সঙ্গে কথা বলতে পারি।

শফিক বলল, কথা বলতে চাইলে বলো।

—মোবাইল রেখেছ কোথায়?

—শার্টের পকেটে আছে।

—এত বড় একটা খবর তুমি গোপন রেখেছ। আশ্চর্য!

মীরা ছুটে বের হয়ে গেল। নিশোর সঙ্গে কথা বলে এখন সে নিশোকে চমকে দেবে। কিছুক্ষণ আগে শফিক তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে, এটা এখন আর মীরার মনে নেই।

—হ্যালো কে? আমার নিশো মা?

—হুঁ।

—বলো তো আমি কে?

—মা।

—হয়েছে। কী করছ মা?

—টিভি দেখছি।

—কার্টুন?

—হুঁ।

—বলো তো কার টেলিফোন করছি।

—জানি না।

—তোমার বাবার টেলিফোন। তোমারে বাবাকে অফিস থেকে দিয়েছে, তুমি কি বাবার সঙ্গে কথা বলবে?

—না। আমি কার্টুন দেখব।

—বাবার সঙ্গে কথা বলো। বাবা খুশি হবে।

—আচ্ছা।

—তুমি ধরে থাকো, আমি টেলিফোনটা বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। টেলিফোনটা কানে দিয়ে রাখো। কান থেকে সরাবে না।

মীরা বালিকাদের মতো আনন্দিত ভঙ্গিতে বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়াল। শফিক কাঁদছে। নিঃশব্দ কান্না না। শব্দ করে কাঁদছে। মীরা তার ছ বছরের বিবাহিত জীবনে এই দৃশ্য প্রথম দেখল।

তিন

শফিকের বাবা নান্দিনা স্কুলের অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার জয়নাল সাহেবকে তাঁর ছাত্ররা ডাকত— ডিকশনারি স্যার। কোনও বিচিত্র কারণে তিনি ইংরেজি ডিকশনারি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। ক্লাসে ঢোকার সময় তাঁর হাতে একটা ডিকশনারি থাকত। রোল কলের আগে ডিকশনারিটা কোনও একজনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন— "একটা কিছু ধর। দেখি আমি পারি কি না। কঠিন কোনও শব্দ খুঁজে বের করবি।" এই খেলা কিছুক্ষণ চলার পর তিনি হৃষ্টচিত্তে রোল কল করতেন। যথারীতি ক্লাস শুরু হত।

ডিকশনারি মুখস্থের পরীক্ষা তিনি শুধু যে ছাত্রদের দিতেন তা না, মাঝে মাঝে বিশিষ্টজনদের কাছেও দিতে হত। স্কুল ইন্সপেকশনে একবার শিক্ষা অফিসার একরামুদ্দিন সাহেব এসেছিলেন। তিনি হঠাৎ জয়নাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনলাম আপনাকে সবাই ডিকশনারি স্যার ডাকে। সত্যি সত্যি ডিকশনারি মুখস্থ করে ফেলেছেন নাকি?

তিনি কিছু বললেন না। লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে থাকলেন। হেডমাস্টার সাহেব (বাবু হরগোপাল রায়, এম এ বিটি গোল্ড মেডাল) বললেন, কথা সত্য। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ডিকশনারি এনে দিই?

একরামুদ্দিন সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, ডিকশনারি লাগবে না। দেখি 'Canter' শব্দের মানে বলুন।

জয়নাল সাহেব নিচু গলায় বললেন, Canter হল ঘোড়ার চলা। খুব দ্রুতও না, আবার খুব হালকা চালেও না। মাঝামাঝি।

—হয়েছে। এখন বলুন 'Squint' কী?

জয়নাল সাহেব অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, টেরা চোখ।

—হয়েছে। Z দিয়ে একটা জিজ্ঞেস করি Zither কী?

—স্যার এটা একটা বাদ্যযন্ত্র।

একরামুদ্দিন সাহেব আর কিছু বললেন না। গম্ভীর হয়ে গেলেন। স্কুল ইন্সপেকশন শেষ করে ঢাকায় ফিরে গেলেন। কিছুদিন পর জয়নাল সাহেব তাঁর কাছ থেকে একটা পার্সেল পেলেন। সেখানে একটা চিঠি এবং চিঠির সঙ্গে চামড়ায় বাঁধাই করা এক ডিকশনারি।

সেই চিঠি এবং ডিকশনারি জয়নাল সাহেবের সঙ্গে এখনও আছে। আগে প্রায়ই চিঠি বের করে পড়তেন। কাগজটা ন্যাতা ন্যাতা হয়ে গেছে বলে এখন আর পড়েন না। ডিকশনারির ভেতর ভাঁজ করে রেখে দিয়েছেন। অবশ্যি পড়ার প্রয়োজনও বোধ করেন না। চিঠির পুরোটাই তাঁর মুখস্থ। চিঠিতে একরামুদ্দিন লিখেছেন—

জনাব ডিকশনারি,

আরজ গুজার। আশা করি আল্লাহপাকের অসীম অনুগ্রহে মঙ্গলমতো আছেন। অনেক বিচিত্র কর্মকাণ্ডের জন্য মনুষ্যসমাজ খ্যাত। আপনার ডিকশনারি মুখস্থ তার মধ্যে পড়ে। আপনি জটিল কর্ম সমাধা করিয়াছেন। আপনাকে অভিনন্দন। আপনাকে দেখিয়া আপনার ছাত্ররাও মুখস্থবিদ্যায়

http://Doridro.com

আপনাকে উপহার স্বরূপ একটি ডিকশনারি পাঠাইলাম। ডিকশনারিটা পুরাতন। পুরাতন হইলেও আপনার পছন্দ হইবে।

আল্লাহপাক আপনাকে ভাল রাখিবেন ইহাই আপনার প্রতি আমার শুভকামনা।

ইতি

একরামুদ্দিন খান।

চামড়ায় বাঁধানো এই ডিকশনারি জয়নাল সাহেবের অতি প্রিয় বস্তুর একটি। তিনি প্রতিদিন কিছু সময় ডিকশনারি নিয়ে বসেন। পাতা ওল্টান। শব্দগুলি দ্রুত পড়েন। সবসময় চর্চায় থাকেন। মুখস্থবিদ্যা চর্চার জিনিস। কোরানে যারা হাফেজ তাদেরকেও প্রতিদিন কিছু সময় কোরান পাঠ করতে হয়।

জয়নাল সাহেব বর্তমানে বাস করেন খিলগায়ের এক হোটেলের (বেঙ্গল হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট) দোতলায় ২৩ নম্বর ঘরে। এখানে থাকার জন্যে তাকে কোনও টাকাপয়সা দিতে হয় না, কারণ বেঙ্গল হোটেলের মালিক মনসুর তাঁর এক সময়ের ছাত্র। হোটেলে থাকা খাওয়ার বিনিময়ে তিনি মনসুরের চার ছেলেমেয়েকে দুইবেলা ইংরেজি পড়ান। মনসুর তাঁকে যথেষ্টই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। যতবারই দেখা হয় ততবারই বলে, টাকাপয়সা লাগলে বলবেন। লজ্জা করবেন না। ছাত্র এবং পুত্রের মধ্যে বেশি-কম কিছু নাই। এটা আপনারই কথা। আমার কথা না। এত জ্ঞানের কথা আমি জানি না।

তিনি টাকাপয়সার ভয়াবহ টানাটানির মধ্যে থাকেন, তার পরেও মনসুরের কাছে এখনও পর্যন্ত কিছু চাননি। আজ মনে হয় চাইতে হবে। তাঁর হাতে কোনও টাকাপয়সা নাই। সকাল থেকে ইচ্ছে করছে ছেলেকে দেখতে। ছেলে থাকে কলাবাগানের গলির ভিতর। খিলগাঁ থেকে হেঁটে হেঁটে ছেলের কাছে যাওয়া সম্ভব না। গত রাতে তিনি ছেলেকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। একটা খাটের উপর ছেলে, ছেলের বউ মীরা আর তাদের মেয়ে নিশো বসে আছে। তিনজনই ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। কান্নার শব্দ শুনে তিনি তাদের কাছে গেলেন। অবাক হয়ে বললেন, কী হয়েছে?

মীরা বলল, বাবা ও ইংরেজি পরীক্ষায় ফেল করেছে। এখন কী হবে বাবা?

তিনি বললেন, সে তো ইংরেজিতেই পাস করেছে। ইংরেজিতে এম এ ডিগ্রি পেয়েছে। এম এ ডিগ্রি তো সহজ ব্যাপার না।

মীরা চোখ মুছতে মুছতে বলল, তাকে দশটা শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করেছে একটাও পারে নাই।

তিনি ছেলের পিঠে হাত রেখে বললেন, কী কী শব্দ জিজ্ঞেস করেছে আমাকে বল দেখি। কান্নার সময় পাওয়া যাবে। শব্দগুলি বল।

শফিক ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, Carp.

—Carp. পারিস নাই! Carp হল একটা ভার্ব। নাউন না। এর মানে— Complain continually about unimportant matters সহজ বাংলা হল— ঘ্যানঘ্যান করা।

—আর কী পারিস নাই বল দেখি—

স্বপ্নের এই পর্যায়ে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বালিশের নীচ থেকে ঘড়ি এনে দেখেন, রাত বাজে দুটো। বাকি রাতে তাঁর আর ঘুম হয়নি। তিনি কিছুক্ষণ শুয়ে, কিছুক্ষণ বসে, কিছুক্ষণ হোটলের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে সময় পার করেছেন। ছেলের জন্যে খুবই মন খারাপ লেগেছে। তার কোনও বিপদ হয়নি তো? আল্লাহপাক বিপদ-আপদের খবর মানুষের কাছে ইশারার মাধ্যমে পৌঁছান। একবার তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন লাল রঙের একটা সাপ তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরেছে। তিনি অনেক ঝাঁকাঝাঁকি করেও সাপটা ছাড়তে পারছেন না। এই স্বপ্ন দেখার কিছুদিন পরই স্কুলের বারান্দায় পিছলে পড়ে তাঁর ডান পা ভেঙে যায়। স্বপ্নের অর্থ তো অবশ্যই আছে। সবাই সব অর্থ ধরতে পারে না।

শফিক তাঁর বড় আদরের ছেলে। ছেলে আশপাশে থাকলে তাঁর এতই ভাল লাগে যে গলা তার ভার লাগে। মনে হয় কেঁদে ফেলবেন। ছেলের দিকে এই জন্যেই তিনি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকেন না। তিনি নিশ্চিত, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে অবশ্যই তাঁর চোখ পানি আসবে। ছেলে তখন অতিব্যস্ত হয়ে বলবে, বাবা কী হয়েছে? ছেলেকে তখন মিথ্যা করে বলতে হবে— কিছু হয় নাই। চোখে কী যেন পড়েছে। ছাত্র এবং পুত্র এই দুই শ্রেণীর কাছে মিথ্যা বলা গুরুতর অন্যায়।

তাঁর এখন উচিত ছেলের সংসারে বাস করা। নিজের জন্যে না, নাতনিটার জন্যে। তিনি তাদের সঙ্গে থাকলে নিশোকে ভালমত ইংরেজিটা ধরিয়ে দিতে পারতেন। বিদেশি ভাষা অল্পবয়সেই ধরিয়ে দিতে হয়। মগজ নরম থাকতেই কাজটা করতে হয়। মগজ একবার শক্ত হয়ে গেলে বিরাট সমস্যা।

ছেলের সংসারে বাস করা তাঁর কাছে কোনও ব্যাপার না। ব্যাগ স্যুটকেস নিয়ে চলে গেলেই হয়। ছেলে খুবই খুশি হবে। সে অনেকবারই তাঁকে বলেছে। ব্যাগ স্যুটকেশ নিয়ে টানাটানি পর্যন্ত করেছে। নানা কারণেই ছেলের সঙ্গে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের একটা মাত্র শোবার ঘর। একটাই বাথরুম। সেই বাথরুম শোবার ঘরের সঙ্গে। তাঁকে রাতে কয়েকবার বাথরুমে যেতে হয়। বাথরুম পেলে তিনি কী করবেন? ছেলে এবং ছেলের বউকে ঘুম থেকে তুলে তারপর বাথরুমে যাবেন? এক রাতে তাদের কবার ঘুম থেকে তুলবেন?

ধরা যাক তারপরেও তিনি থাকতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই খবর ছেলের মা'র কানে যাবে। এই মহিলা বাস করেন তাঁর বড় মেয়ের সঙ্গে। মহিলার আছে 'Carp' সমস্যা। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করা। তিনি শুরু করবেন ঘ্যানঘ্যান, 'তুমি ছেলের সংসারে সুখে থাকবে আমি কেন মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে থাকব? তুমি যেখানে থাকবে আমি থাকব সেখানে। মেয়ে জামাইয়ের সংসারে আমি আর থাকব না। প্রয়োজনে আমি তোমার হোটেলে এসে উঠব।' এই মহিলার মাথায় সামান্য ছিট আছে। বিছানা বালিশ নিয়ে হোটেলে চলে আসতে পারে। যদি আসে বিরাট সমস্যা হবে।

স্বামী-স্ত্রীর দুজন এক সঙ্গে ছেলের কাছে থাকতে যাবেন সেটা এই মুহূর্তে অসম্ভব। ছেলে খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। তার নিজেরই দিন চলে না। কোনও চাকরিতে সে স্থির হতে পারছে না। তার সংসারে বিরাট অভাব। বিয়ের সময় বউমাকে তার মা সামান্য কিছু গয়না দিয়েছিলেন। সোনার চুড়ি, চেন, কানের দুল। এখন বউমার শরীরে কোনও সোনাদানা নেই। বিবাহিত মেয়ে সবসময় গায়ে কিছু না কিছু সোনা রাখে। এই মেয়ের গায়ে কিছুই নেই কেন তা কি তিনি জানেন না? ঠিকই জানেন। এমন যাদের সংসারের অবস্থা তাদের ঘাড়ে দুই বুড়োবুড়ি সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসতে পারেন না।

আজ শুক্রবার। জয়নাল সাহেবের ছুটির দিন। ছাত্র পড়াতে যেতে হবে না। তার পরেও তিনি ঠিক করলেন, যাবেন। মনসুরের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করবেন। ছেলের বাড়িতে খালি হাতে উপস্থিত হওয়া ঠিক না। বাচ্চা একটা মেয়ে আছে। তার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত। শিশুকন্যার জন্যে উপহার দেবার বিষয়ে নবিজির হাদিসও আছে— "যে ব্যক্তি তার শিশুকন্যার জন্যে উপহার নিয়ে যায় সে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে খাদ্যদানের পুণ্য সঞ্চয় করে।"

জয়নাল সাহেব সকাল আটটায় মনসুরের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে শুনলেন কিছুক্ষণ আগেই মনসুর তার ছেলেমেয়ে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেছে। আজ আর ফিরবে না। তিনি হোটেলে ফিরে এলেন। অনেক চিন্তাভাবনা করে হোটেলের ম্যানেজার কায়েস মিয়ার কাছে গেলেন। ধার হিসাবে একশো টাকা পাওয়া যায় কিনা।

কায়েস মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, 'স্যারের হুকুম ছাড়া টাকা পয়সার লেনদেন আমার জন্যে নিষেধ আছে।'

তিনি নিজের ঘরে এসে এখন কী করা উচিত ভাবতে বসলেন। হেঁটে হেঁটে রওনা দেবেন? যতক্ষণ পারবেন হাঁটবেন। তারপর রিকশা নিয়ে নেবেন। ছেলের বাসায় পৌঁছে মীরাকে বলবেন রিকশাভাড়াটা দিয়ে দিতে। সমস্যা হবে যদি মীরার কাছে রিকশা ভাড়া না থাকে। থাকবে নিশ্চয়ই। মেয়েদের কাছে গোপন কিছু টাকা সবসময়ই থাকে। তবে তিনি

http://Doridro.com

চেষ্টা করবেন হেঁটে হেঁটে যেতে। বিশ্রাম করতে করতে যাবেন, সমস্যা-কী? সঙ্গে ছাতা থাকতে হবে। বৃষ্টি-বাদলার দিন, কখন বৃষ্টি নামে তার নেই ঠিক। ছাতা একটা জোগাড় করতে হবে। তাঁর নিজের ছাতা গত বৎসর বর্ষার সময় হারিয়ে ফেলেছিলেন আর কেনা হয়নি। ম্যানেজার কায়েস মিয়ার কাছে ছাতা চাইলে সে কী ছাতা জোগাড় করে দেবে! না-কি সে বলবে— স্যারের হুকুম ছাড়া ছাতা দিতে পারব না।

দরজায় টুকটুক করে টোকা পড়ছে। শফিক এই ভঙ্গিতেই দরজায় টোকা দেয়। সে কি এসেছে? জয়নাল সাহেবের বুকে ছলাত করে একটা শব্দ করল। তিনি মনের উত্তেজনা গোপন করে কোলের উপর ডিকশনারি নিতে নিতে বললেন, দরজা খোলা। কোলে ডিকশনারি নেওয়ার পেছনে কারণ হল, যদি শফিক হয়, তা হলে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন ডিকশনারির পাতা উল্টাতে উল্টাতে। যেন ছেলে তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। সে দেখা করতে এলেও কিছু না। না এলেও কিছু না।

—বাবা কেমন আছ?

—ভাল। বোস।

তিনি আড়চোখে ছেলের দিতে তাকাচ্ছেন। ছেলে কোথায় বসে এটা দেখার বিষয় আছে। সে চেয়ারে বসতে পারে। তা হলে বাবার কাছ থেকে অনেকটা দূরে বসা হয়। আবার কাছে খাটে বসতে পারে। তাঁর ধারণা ছেলে বাবার কাছাকাছি বসবে। দেখা যাক অনুমান সত্যি হয় কি না।

শফিক খাটে এসে বসল।

তিনি ডিকশনারির পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন, বৌমার শরীর কেমন?

—ভাল।

—নিশো?

—সেও ভাল।

—টিফিন ক্যারিয়ার করে কী এনেছিস?

—মীরা সকালবেলা খিচুড়ি মাংস রান্না করেছিল। তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি। বাবা তুমি নাশতা করে ফেলেছ?

—এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকব নাকি?

—দুপুরে খেও। কাউকে বললে গরম করে দেবে না?

—দেবে। বাসি খাবার খেয়ে কোনও আরাম নেই। দেখ তো টেবিলের উপর একটা চামচ আছে কি না। গরম গরম খাই।

জয়নাল সাহেব খুবই আরাম করে খাচ্ছেন। ঘরের রান্নার স্বাদ তুলনাহীন। খেতে খেতেই তিনি লক্ষ করলেন শফিক বালিশের নীচে কিছু রাখল। এটা শফিকের স্বভাব। যতবারই আসে বালিশের নীচে টাকা পয়সা রেখে যায়। গোপনে রাখে। সরাসরি বাবার হাতে তার টাকা দিতে লজ্জা লাগে। বালিশের নীচে শফিক যখন টাকা রাখে তখন তিনি নিজেও এমন ভাব করেন যেন দেখতে পাননি।

—তোর মার কোনও খবর আছে?

—মা ভাল আছেন। বাবা শোনো, আমি নতুন একটা চাকরি পেয়েছি।

—কী চাকরি?

—একজন বিশাল বড়লোকের পার্সোনাল ম্যানেজার।

—কাজটা কী?

—মাত্র তো জয়েন করেছি—এখনও বুঝতে পারছি না কাজটা কী।

—যে কাজই করবি মন দিয়ে করবি।

—কাজটা টিকবে কি না বুঝতে পারছি না। যদি টেঁকে বড় একটা বাসা ভাড়া করব। তোমাকে আর মাকে আমার সঙ্গে রাখব।

—আমাদের জন্যে চিন্তা করিস না। আগে ঋণমুক্ত হ। ঋণ আছে না?

—আছে।

—পারলে তোর মার হাতে কিছু টাকাপয়সা দিস। আমারই দেওয়া উচিত। আমি তো আর পারছি না। টাকা হাতে থাকলে ওই মহিলার মেজাজ খুব ভাল থাকে। এমনিতে ঘ্যান ঘ্যান স্বভাব। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করা ইংরেজি কী বল দেখি?

—জানি না বাবা।

—বলিস কী? তুই না ইংরেজির ছাত্র? তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করার ইংরেজি হল carp সি এ আর পি।

—তুমি কি এখনও ডিকশনারি মুখস্থ করেই যাচ্ছ।

—অসুবিধা কী?

—শুধু শুধু ভারী একটা বই মাথায় নিয়ে বসে থাকা। বাবা তুমি আর খেও না। সকালে নাশতা খেয়ে এতটা খিচুড়ি খাওয়া ঠিক না। শরীর খারাপ করবে।

—বৌমার রান্নার হাত ভাল। তোর মার চেয়েও ভাল। খেয়ে মজা পেয়েছি। তোর মা আসলে রান্না বান্না কিছু জানে না। carping করে কূল পায় না রাঁধবে কখন? বৌমাকে মনে করে বলিস খেয়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছি।

—বলব।

—বৌমাকে সুখে রাখার চেষ্টা করবি। যে ব্যক্তি মাতা স্ত্রী এবং কন্যা এই তিন শ্রেণীকে সুখী রাখে আল্লাহপাক তার জন্যে তিনটা রহমতের দরজা খুলে দেন।

শফিক বলল, বাবা আমি উঠি। আমাকে একটু নারায়ণগঞ্জ যেতে হবে।

—নারায়ণগঞ্জ কী জন্যে?

—স্যার একটা কাজে পাঠাচ্ছেন। একজনকে কিছু ফলমূল দিয়ে আসতে হবে।

—একটু অপেক্ষা কর টিফিন কেরিয়ার ধুয়ে দেই।

—খিচুড়ি সব খেয়ে ফেলেছ?

—হুঁ।

—তোমাকে ধুতে হবে না। বাসায় নিয়ে ধুলেই হবে।

ছেলে চলে যাচ্ছে জয়নাল, সাহেবের খুবই খারাপ লাগছে। ছেলের সঙ্গে আজ গল্পই হয়নি। কিছুক্ষণ থাকতে বললে অবশ্যই থাকবে। থাকতে বলা ঠিক হবে না। সে একটা কাজে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভাল হয় ছেলের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ চলে যাওয়া। একসঙ্গে কিছুক্ষণ ঘুরবেন। তা ছাড়া নারায়ণগঞ্জ তাঁর দেখাও হয়নি। নারায়ণগঞ্জ যা তা শহর না। বাংলার ডান্ডি।

—বাবুল।

—জ্বি বাবা।

—নারায়ণগঞ্জ যাবি কী ভাবে? বাসে?

—অফিস থেকে আমাকে একটা গাড়ি দিয়েছে।

—চিন্তা করছি, তোর সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঘুরে আসব কি না। নারায়ণগঞ্জ কখনও যাইনি। তুই তোর কাজ করলি, আমি গাড়িতে বসে থাকলাম।

শফিক বলল, চলো। রেডি হয়ে নাও।

—রেডি তো আছিই।

তিনি ডিকশনারি হাতে উঠে দাঁড়ালেন। শফিক বলল, তুমি ডিকশনারি নিচ্ছ কেন?

তিনি বললেন, হাতের কাছে থাকল। অসুবিধা কী? সময়ে অসময়ে চোখ বুলালাম। সবসময় চর্চার উপর থাকা দরকার।

গাড়িতে উঠে তাঁর খুব ভাল লাগছে। তাঁর মনে হচ্ছে জীবনটা আসলেই সুন্দর এবং তিনি একজন সুখী মানুষ। রাস্তা ভর্তি মানুষজন। তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগছে। সবাই কেমন সুখী সুখী। বিশেষ করে ফুলওয়ালি মেয়েগুলিকে। তারা বেলি ফুল নিয়ে ছোটাছুটি করছে। কী সুন্দর করেই না বলছে—ফুল নিবেন? ফুল? একটা বেলি ফুলের মালা কিনলে খারাপ হয় না। শফিককে কি বলবেন একটা মালা কিনে দিতে? তাঁর হাত খালি। বালিশের নিচ থেকে টাকাটা আনা হয়নি। শফিকের সামনে টাকা আনতে লজ্জা লাগল বলে আনেননি। এখন মনে হচ্ছে টাকাটা থাকলে ভাল হত। শূন্য পকেটে ঢাকার বাইরে যাওয়া হচ্ছে এটা ঠিক না। অবশ্যি ছেলে সঙ্গে আছে। ছেলে সঙ্গে থাকা অনেক বড় ব্যাপার। ছেলে পাশে থাকলে বুকে হাতির বল থাকে।

http://Doridro.com

—বাবুল।

—জ্বি বাবা।

—পুলিশ সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হলে আমাকে বলবি।

শফিক অবাক হয়ে বলল, পুলিশ সংক্রান্ত সমস্যা হলে তোমাকে বলব কেন? পুলিশের সঙ্গে তোমার কী?

—ঢাকা সাউথের পুলিশ কমিশনার আমার ছাত্র।

—তাই নাকি?

জয়নাল সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, মজার ইতিহাস। গত পরশুদিন বিকালবেলা সায়েন্স ল্যাবরেটরির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ আমার সামনে ঘ্যাঁস করে একটা পুলিশের গাড়ি থামল। তাকিয়ে দেখি একজন পুলিশ অফিসার নামছেন। আশপাশের সবাই তটস্থ। আমিও তাকিয়ে আছি। দেখি পুলিশ অফিসার এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তারপর কিছু বুঝার আগেই ঝুপ করে আমার পা ছুঁয়ে সালাম। সালাম করতে করতেই বলল, স্যার আমি আপনার ছাত্র। আমি বললাম, কেমন আছ বাবা? সে বলল, স্যার গাড়িতে উঠেন। আমি আপনাকে বাসায় নিয়ে যাব। আমার স্ত্রীকে আমি আপনার কথা বলেছি। সে বিশ্বাসই করে না কেউ পুরো ডিকশনারি মুখস্থ করতে পারে। আজ প্রমাণ হয়ে যাবে।

—গিয়েছিলে বাসায়?

—হ্যাঁ। তার স্ত্রীর নাম কেয়া। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জিওগ্রাফিতে মাস্টার্স করেছে। তাদের একটাই ছেলে। ছেলের নাম টগর। সানবিম নামে একটা ইংরেজি স্কুলে থার্ড গ্রেডে পড়ে। খুবই ভাল ছাত্র। প্রতিবার ফার্স্ট হয়। শুধু এইবার থার্ড হয়েছে। পরীক্ষার আগে আগে জ্বর হয়েছে বলে রেজাল্ট ভাল হয়নি।

—তুমি দেখি বাড়ির সব খবর নিয়ে চলে এসেছ।

—অনেকক্ষণ ছিলাম। রাতে খেয়ে এসেছি। কেয়ার রান্নার হাত ভাল। বেশ ভাল।

—ইংরেজি পরীক্ষা দাওনি?

—দিয়েছি। কেয়া আর তার স্বামী দুজনেই ডিকশনারি নিয়ে বসেছিল।

—কোনও শব্দ মিস করেছ?

—আরে না। মিস করব কেন? এর মধ্যে টগরও একটা শব্দ জিজ্ঞেস করল `Violet', আমি ভাব করলাম যে এই শব্দটার মানে জানি না। টগর খুবই খুশি যে আমাকে আটকাতে পেরেছে।

শফিক হাসতে হাসতে বলল, বাবা, তুমি সুখেই আছ।

জয়নাল সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, পথে যদি গাড়ি ট্রাফিক সিগন্যালে থামে আর কোনও ফুলওয়ালি পাওয়া যায় তা হলে একটা বেলি ফুলের মালা কিনে দিস তো।

—মালা দিয়ে কী করবে?

—কিনলাম আর কি? নবীজির হাদিস মনে আছে না—

জোটে যদি শুধু একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুইটি পয়সা জোটে যদি কভু
ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।

শফিক গাড়ি থামিয়ে চারটা ফুলের মালা কিনল।

একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। বাগানে যত্ন নেওয়া হয় এটা বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির সামনে গোল বারান্দার মতো আছে। সেখানে সিলিং থেকে ফুলের টব ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বারান্দায় বেতের চেয়ার পাতা। সব মিলিয়ে কেমন সুখী সুখী ভাব।

যে মহিলা দরজা খুললেন তাঁর মুখও সুখী সুখী। মোটাসোটা একজন মহিলা। মাথার চুল লালচে। মনে হয় মেহেন্দি দিয়ে রঙ করেছেন। মুখ ভর্তি পান। এই বয়সেও ভদ্রমহিলা যথেষ্টই রূপবতী। পাতলা টেটি। বড় বড় চোখ, মুখ গোলাকার, যেন কম্পাস দিয়ে মুখ আঁকা হয়েছে।

শফিক বলল, ম্যাডাম আমার নাম শফিক। শফিকুল করিম। আমি মকিনুর রহমান সাহেবের পি এ। স্যার আপনার জন্যে কিছু ফল পাঠিয়েছেন।

—আমার জন্যই পাঠিয়েছেন এটা এত নিশ্চিত হয়ে বলছেন কী ভাবে? আপনি তো আমাকে চেনেন না। আমার ছবি দেখার কথা না। আপনি আমার কোনও ছবি দেখেননি। আপনার স্যারের কাছে আমার কোনও ছবি নেই। আসুন ভেতরে আসুন।

শফিক বসার ঘরে ঢুকল।

—জুতা খুলে আসুন। কাউকে জুতা খুলে ঘরে ঢুকতে বলা খুবই অভদ্রতা। এই অভদ্রতা বাধ্য হয়ে করছি।

শফিক বসার ঘরে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সুন্দর করেই না ঘরটা সাজানো। মেঝেতে শীতলপাটি বিছানো। সোফা নেই, কুশনের উপর বসার ব্যবস্থা। প্রতিটি কুশন শাদা ওয়াড় দেওয়া। সেখানে সূচির কাজ আছে। নীল সুতায় করা নকশা। দেওয়ালে বাঁশের ফ্রেমে সুন্দর জলরঙের সুন্দর ছবি।

ভদ্রমহিলা শফিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘরে ঢুকলেই শান্তি শান্তি ভাব হয় না?

—জ্বি হয়।

—আমার কিন্তু হয় না। ঘর সাজানোর শখ আমার মেয়ের, আমার না। বসুন। আমি ছাত্র পড়িয়ে কুল পাই না ঘর সাজাব কী?

শফিক বসল। ভদ্রমহিলা শফিকের সামনে বসতে বসতে বললেন, আমাকে ফল পাঠানো খুবই হাস্যকর ব্যাপার। আমি ফল খাই না। যে কোনও ফল খেলেই আমার অ্যাসিডিটি হয়। আমার মেয়েও খায় না। কোনও আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যে পাঠাব সেটাও সম্ভব না। আমার লোকবল নেই। একটা মেয়ে নিয়ে সংসার।

—আপনি যদি ঠিকানা লিখে দেন, আমি আপনার আত্মীয় স্বজনের বাসায় পৌঁছে দেব। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

—আপনাকে ফল নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে না।

—ম্যাডাম আমার কোনও অসুবিধা নেই।

—আপনার অসুবিধা না থাকতে পারে। আমার আছে।

—ম্যাডাম আমাকে তুমি করে বলবেন।

—তুমি করে বলব কেন?

লায়লা প্রশ্নটা এমনই কঠিন করে করলেন যে শফিক হকচকিয়ে গেল। মহিলা তাকিয়ে আছেন এক দৃষ্টিতে যেন প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত দৃষ্টি ফেরাবেন না।

—আপনার নাম শফিক তাই না?

—জ্বি ম্যাডাম।

—আপনি আমার প্রতি অতি বিনয় দেখাচ্ছেন, তার কারণ আপনার স্যার আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এই থেকে আপনার ধারণা হয়েছে, আমি বিশেষ কেউ। আসলে কিন্তু তা না। কাজেই প্রতি সেকেন্ডে একবার করে ম্যাডাম ডাকা বন্ধ।

—জ্বি আচ্ছা। কী ডাকব?

—কিছু কি ডাকতেই হবে?

মহিলা আবারও আগের মতো কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। শফিক অস্বস্তি বোধ করছে। হঠাৎ করেই ভদ্রমহিলার চোখের দৃষ্টি কোমল হল। তিনি বললেন, গাড়িতে একজন বুড়ো মতো ভদ্রলোক বসে আছেন উনি কে?

—আমার বাবা। আমার সঙ্গে এসেছেন।

—তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছেন কেন! নিয়ে আসুন। আমি চা বানাচ্ছি— চা খাবেন।

—ম্যাডাম আমি চা খাব না।

—চা না খেলে অন্য কিছু খাবেন। আপনি কি জানেন, আপনার স্যারের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল?

—জানি।

—সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী বিয়ে। গিনেস বুকে ওঠার মতো ব্যাপার।

http://Doridro.com

আমার বিবাহিত জীবন ছিল দেড় ঘণ্টার।

—স্যার কিন্তু বলেছেন সাত ঘণ্টা।

—উনি তাই বলেছেন?

—জ্বি। রাত একটা দশে বিয়ে হয়েছিল ভোর আটটা দশে বিয়ে ভেঙে যায়।

—তাহলে তো বেশ দীর্ঘস্থায়ী বিয়ে। গিনেস বুকে ওঠার মতো না।

ভদ্রমহিলা হাসছেন। হাসলে সব মানুষকেই সুন্দর লাগে। এই মহিলাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে এই মহিলা দূরের কেউ না। কাছের একজন। শফিক বলল, ম্যাডাম আমি কি আমার বাবাকে নিয়ে আসব?

—অবশ্যই। এখন বাজে দুপুর দেড়টা। দুপুরবেলার অতিথিকে আমি শুধু চা খাইয়ে বিদায় করব এটা ভাবারও কোনও কারণ নেই। দুপুরবেলা আপনারা দু'জন আমার সঙ্গে খাবেন। আয়োজন খুবই সামান্য, তাতে কী?

ফেরার পথে জয়নাল সাহেব ছেলের পাশে বসলেন না। ড্রাইভারের পাশে বসলেন। ড্রাইভারের পাশে সিটটা বসার জন্যে সবচেয়ে ভাল। পা ছড়িয়ে বসা যায়। সামনের দৃশ্য দেখা যায়। ছেলের সঙ্গে না বসার পিছনে আর একটা কারণও আছে, ছেলে হয়তো সিগারেট খাবে। বাবার পাশে বসলে সেটা সম্ভব না। সিগারেট টানতে টানতে ভ্রমণের আলাদা মজা, সেই মজা থেকে ছেলেকে বঞ্চিত করা ঠিক না। একজন আদর্শ পিতার উচিত তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ রাখা। তিনি তা পারছেন না। কারণ তিনি কোনও আদর্শ পিতা না। আদর্শ পুত্র হওয়া সহজ। আদর্শ পিতা হওয়া সহজ না। তিনি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ড্রাইভার সাহেব আপনার নাম কী?

ড্রাইভার বলল, স্যার আমার নাম রঞ্জু।

—দুপুরের খাওয়া ঠিক মতো করেছেন?

—জ্বি স্যার।

—খাওয়া ভাল ছিল না?

—জ্বি ছিল।

—বেগুন ভাজি ভাল ছিল না?

—জ্বি।

—বেগুনের ইংরেজি হল Bringal. বাচ্চাকাচ্চারা সবজির ইংরেজি কম জানে। আলুর ইংরেজি সবাই বলতে পারবে, Potato, কারণ আলু তারা খায়। সবজি খায় না, এই জন্যে সবজির ইংরেজি জানে না। বেগুনের ইংরেজি বলতে পারবে না, পটলের ইংরেজিও না। বুঝতে পারছেন?

—জ্বি স্যার।

—ঢেড়শের ইংরেজি বাচ্চারা বলবে Ladies Finger মেয়েমানুষের আঙুল। এটাও ঠিক না। ঢেড়শের ইংরেজি হল OKRA। আপনার ছেলেমেয়ে আছে?

—স্যার একটা ছেলে।

—ইংরেজি কেমন জানে?

—জানি না স্যার। আমি মূর্খ মানুষ কীভাবে জানব!

—একদিন নিয়ে আসবেন আমার কাছে। আমি টেস্ট করে দেখব।

—স্যার আপনার অনেক মেহেরবানি।

—আপনার গাড়িতে গান, বাজনার ব্যবস্থা আছে?

—জ্বি স্যার আছে।

—গান দিয়ে দেন। গান শুনতে শুনতে যাই।

—কী গান দিব স্যার?

—আপনার যেটা ইচ্ছা দেন।

ড্রাইভার গান ছেড়ে দিল। জয়নাল সাহেব গানের তালে তালে মাথা দুলাতে লাগলেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে এই জগতে তাঁর মতো সুখী মানুষ আর কেউ নেই। গানের কথাগুলিও তাঁর কাছে ভাল লাগছে। কী সুন্দর কথা—

একটা ছিল সোনার কন্যা মেঘবরণ কেশ
ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কন্যার দেশ ॥

জয়নাল সাহেবের মনে হল তিনি চোখের সামনে ভাটি অঞ্চলের সোনার কন্যাকে দেখতে পাচ্ছেন যার কেশ মেঘবরণ। সোনার কন্যার সঙ্গে তিনি তাঁর পুত্রবধূ মীরার আশ্চর্য সাদৃশ্যও লক্ষ করলেন।

চার

মবিনুর রহমান শফিকের দিকে তাকিয়ে আছেন। একবারও চোখের দৃষ্টি সরাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে সামান্য ঝুঁকে আসছেন আবার সরে যাচ্ছেন। রকিং চেয়ারে বসে থাকার সময় যা করেন তাই। অথচ তিনি এখন রকিং চেয়ারে বসে নেই। তিনি বসে আছেন তাঁর শোবার ঘরের মেঝের কার্পেটে। শফিক বসেছে তাঁর সামনে। এই ঘরে আজ সে প্রথম ঢুকল। বড় সাহেবের শোবার ঘর হিসেবে এই ঘরটা ছোট। বেশ ছোট। তার চেয়ে বড় কথা এখানে কোনও খাট নেই। আসবাবপত্র নেই। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট আছে। ঘরের এক কোনায় বালিশ, কোলবালিশ এবং কম্বল দেখা যাচ্ছে। বড় সাহেব সম্ভবত সেখানে ঘুমান। হয়তো তিনি খাটে ঘুমাতে পারেন না। হয়তো ডাক্তার বলে দিয়েছে মেঝেতে ঘুমুতে। কিংবা তিনি নিজেই হয়তো শখ করে মেঝেতে শুয়ে থাকেন। বড়মানুষরা বিচিত্র কর্মকাণ্ড করতে ভালবাসেন।

—বাবুল।

—জ্বি স্যার।

—লায়লা তোমাকে দুপুরে ভাত খাইয়েছে?

—জ্বি স্যার।

—মেনু কি ছিল বলো তো?

—বেগুন ভাজি, মুরগির মাংসের ঝোল।

—ডাল ছিল না?

—ডাল ছিল স্যার।

—ডালের কথাটা বাদ দিলে কেন? আমার কাছে যখন কোনও বিষয়ে রিপোর্ট করবে তখন কিছুই বাদ দেবে না। কী ডাল ছিল মসুর ডাল, না মুগ ডাল?

—মুগ ডাল।

—মুরগীর ঝোলে কোনও তরকারি ছিল?

—পেঁপে ছিল। আলুর মতো গোল করে কাটা পেঁপে।

—ভাল মতো চিন্তা করে দেখ কোনও ডিটেল কি বাদ গেছে?

—জ্বি না স্যার।

—সব বলা হয়েছে?

—জ্বি স্যার।

—লেবু ছিল না?

—ছিল স্যার।

—লেবুর কথা তো বাদ দিলে। চিন্তা করে দেখো আর কিছু কী বাদ গেছে?

—জ্বি না স্যার।

—একটা ব্যাপারে বাদ দিয়ে গেছ। তোমার সঙ্গে তোমার বাবা ছিলেন। এই কথাটা বলোনি।

শফিক হকচকিয়ে গেল। সে তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে এই তথ্য বড় সাহেব জানবেন, সে ভাবেনি। তিনি কি রাগ করেছেন? তাঁর মুখ দেখে সে রকম মনে হচ্ছে না। হাসি হাসি মুখ। চোখের দৃষ্টি যদিও তীক্ষ্ণ।

—তোমার বাবা কি দুপুরের খাবার খেয়ে খুশি হয়েছিলেন?

—জ্বি স্যার। খুব খুশি হয়েছেন।

—খাবারেরর আয়োজন তো তেমন কিছু না। তাহলে খুব খুশি কেন হলেন?

—আমার বাবা অল্পতেই খুশি হন। তাছাড়া ম্যাডাম খুব যত্ন করেছেন।

—খুব যত্ন করেছেন মানে কী? তোমরা যখন খাচ্ছিলে তখন পাখা

http://Doridro.com

চাকরি দিয়েছেন। আজ সে জয়েন করবে।

কী ধরনের চাকরি সে বুঝতে পারছে না। ওনার পি এ টাইপ কিছু? নাকি বাজার সর্দার? প্রতিদিন সকালে গাড়ি ভর্তি বাজার আনতে হবে। চাকরির শর্তে কিছুই বলা নেই। বেতনের অঙ্কটা লেখা আছে মাসে বারো হাজার এবং অন্যান্য সুবিধা। অন্যান্য সুবিধা কী কে জানে।

এক এক কাজে এক এক ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়। পত্রিকা অফিসে যখন কাজ করত তখন অন্যান্য সুবিধার মধ্যে ছিল ফ্রি চা। বেতনের কোনও ঠিক ঠিকানা নেই কিন্তু যখন ইচ্ছা তখন চা খাওয়া। রং চা, দুধ চা, মাঝে মধ্যে মালাই চা বলে এক বস্তু। দুধের সর দিয়ে বানানো।

সে কিছুদিন ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করেছে। সেখানের সুবিধা বিনা টিকিটে বিমান ভ্রমণ। আন্টার্কটিকা ট্রাভেলস এর মালিক বজলুল আলম চাকরি দেওয়ার সময় শফিকুল করিমের পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন— বিনা টিকিটে দেশ-বিদেশ ঘুরবেন। যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাবেন। জাপান ইউরোপ আমেরিকা কোনও ব্যাপারই না। অফ সিজনে যাবেন, এয়ারলাইন্স ফ্রি বিজনেস ক্লাসের টিকিট দেবে। আত্মীয়স্বজন বিদেশ যাচ্ছে? টেলিফোন করে বলে দেবেন তাদের নরমাল ইকনমি ক্লাস টিকিট হয়ে যাবে বিজনেস ক্লাস। পায়ের উপর পা তুলে ভ্রমণ।

শফিকুল করিমের জীবনে একবারই ফ্রি টিকিট জুটেছিল। ঢাকা কাঠমাণ্ডু ঢাকা। কাঠমাণ্ডু যাওয়া হয়নি, তার আগেই চাকরি চলে গেল। আন্টার্কটিকা ট্রাভেলস এর মালিক বজলুল আলম তার পিঠে হাত রেখে বললেন, সরি ভাই। আপনাকে দিয়ে আমাদের পোষাচ্ছে না। আমাদের আরও স্মার্ট লোক দরকার। আপনি একটু স্লো আছেন।

বজলুল আলমের অভ্যাস ছিল পিঠে হাত রেখে কথা বলা। বস শ্রেণীর মানুষদের কথা বলার অনেক প্যাটার্ন আছে। কেউ কথা বলে পিঠে হাত রেখে। কেউ কথা বলে চোখের দিকে না তাকিয়ে (প্রাইড পত্রিকার সম্পাদক হাসনাইন খান) আবার কেউ কথাই বলে না। যেমন বেগম রোকেয়া গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল আব্দুল মুকিত খান। শফিকুল করিম সেই কলেজে এক বৎসর এগারো মাস কাজ করেছে। বেতন ভাল ছিল না তবে মাসের সাত তারিখের মধ্যেই পাওয়া যেত। দুই ঈদে বোনাস ছিল। হুট করে চাকরি চলে গেল। প্রিন্সিপাল আব্দুল মুকিত খান সাহেব কম্পিউটার টাইপ করা চিঠিতে জানালেন— "কলেজ পরিচালনা পরিষদ আপনার বিরুদ্ধে 'ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশান নিয়েছে।" শফিকুল করিম কী ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেছে সেটা জানার জন্যে আধঘণ্টা প্রিন্সিপাল সাহেবের ঘরে বসে রইল। তিনি কোনও কথা বললেন না। এই আধঘণ্টা তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে নাকের লোম ছিঁড়ে টেবিলের উপর রাখা এ ফোর সাইজ কাগজে জমা করতে লাগলেন। যেন তিনি নাকের লোম দিয়ে মহৎ কোনও শিল্পকর্ম করছেন। শিল্প সৃষ্টিতে তিনি নিমগ্ন। এই সময়ে কারও দিকে তাকানো যাবে না এবং কারওর কথার কোনও জবাব দেওয়া যাবে না।

আতর বাড়ির মালিক মবিনুর রহমান সাহেবের নিয়মকানুন কী কে জানে। নিয়মকানুন নিশ্চয়ই আছে। থাকতেই হবে। হয়তো কথা বলার সময় তাঁর মুখ দিয়ে থুতু বের হয়। এই থুতু হাসি মুখে গায়ে মাখতে হবে।

শফিকুল করিম সিগারেট ফেলে দিয়ে গেটের কলিং বেল টিপল। ঢাকা শহরের বেশির ভাগ বাড়ির গেটের কলিং বেল কাজ করে না। বেল টেপার পরপরই অনেকক্ষণ গেটে ধাক্কাধাক্কি করতে হয়। এই বাড়িরটা কাজ করছে। দুবার বেল টিপতেই গেট খুলে গেল। দারোয়ান গলা বের করে বলল, কারে চান?

দারোয়ানকে দেখে স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে। সে লুঙ্গির উপর খাকি শার্ট পরেছে। তার মানে আতর বাড়ি ঢিলাঢালা অবস্থায় চলে। নিয়মকানুন কঠিন না। কঠিন নিয়ম হলে খাকি শার্টপ্যান্ট, বুট জুতো সবই থাকত। মুখও হাসি হাসি থাকত না। তাদের মুখ দেখে মনে হত কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যুদ্ধে রওনা হবে।

—আমার নাম শফিকুল করিম। আমি মবিনুর রহমান সাহেবের নতুন পি এ। চাকরিতে জয়েন করতে এসেছি। স্যার আছেন না?

—জি আছেন। উনি চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতেই থাকেন। দোতলায় চলে যান। উনি দোতলায় থাকেন। আমরা স্টাফরা থাকি এক তলায়।

—সিঁড়ি কোন দিকে?

—সোজা যান। শেষ মাথা পর্যন্ত যাবেন। ডাইনে তাকাবেন— সিঁড়ি।

শফিকুল করিম অবাক হয়ে বলল, সোজাসুজি দোতলায় চলে যাব। নীচে কাউকে কিছু জানাতে হবে না?

—ক্যাশিয়ার সোবাহান সাহেব আছেন। ওনার সঙ্গে দেখা করেন।

—উনি কোথায় বসেন?

—অফিস ঘরে বসেন। উত্তর দিকে যান। হলুদ রঙের আলাদা একতলা যে দালান দেখতেছেন ওইটাই অফিস। ক্যাশিয়ার সাব অফিসে আছেন। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, চলেন আপনারে দিয়া আসি।

অফিস ঘরের বারান্দায় মোটামুটি ভাল জটলা। মজার কিছু হচ্ছে। সবাই আগ্রহ নিয়ে দেখছে। তবে কারও মুখেই কোনও কথা নেই। সাপ খেলা না-কি? সাপ খেলার সময় দর্শকরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখে। তবে সাপ খেলা, বাঁদর খেলা এইসব নিম্নবিত্তের জিনিস। বড় মানুষরা বড় খেলা দেখেন। সাপ-খোপ দেখেন না। শফিকুল করিম বলল, ওখানে কী হচ্ছে?

দারোয়ান গলা নামিয়ে বলল, আমজাদ স্যারের শাস্তি হইতেছে।

শাস্তি হচ্ছে মানে কী? কী শাস্তি হচ্ছে?

কাছে গেলেই দেখবেন। কানে ধইরা উঠবোস।

সত্যি সত্যি একজন বয়স্ক চশমা পরা মানুষ কান ধরে ওঠবস করছে। একজন কাগজ কলম নিয়ে সামনে আছে। সে মনে হয় ওঠবসের হিসাব রাখছে। যিনি ওঠবস করছেন তাঁর পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে গেছে। যিনি হিসাব রাখছেন তিনি বললেন, আমজাদ সাহেব এখন কিছুক্ষণ রেস্ট নেন। পানি খান।

ওঠবস করা মানুষটা সবুজ রঙের প্লাস্টিকের চেয়ারে বসল। চেয়ারের সামনে স্ট্যান্ড ফ্যান। একজন এসে ফ্যানের মুখ ঘুরিয়ে দিল। আমজাদ নামের মানুষটা হা করে ফ্যানের বাতাস মুখে নিচ্ছে। মানুষটা ফর্সা, এখন তাকে টকটকে লাল দেখাচ্ছে। তার হাতে পানির গ্লাস ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি গ্লাস হাতে বসে আছেন। গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন না।

কাগজ কলম হাতে মানুষটা শফিকুল করিমের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, আপনের এইখানে কী? কী চান?

—ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলব।

—অফিসে যান। বারান্দায় ভিড় করেছেন কেন? এইখানে মজা দেখার কিছু নাই।

শফিকুল করিম অফিস ঘরে ঢুকল।

একটা আই বি এম পার্সোনাল কম্পিউটারের সামনে যে লোক বসে আছে সেই সম্ভবত সোবাহান সাহেব। ভগ্নস্বাস্থ্যের একজন মানুষ। চোখের নীচে কালি। গাল ভাঙা। খাবলা খাবলা ভাবে মাথার চুল উঠেছে। বয়স খুব বেশি হবে না, তবে দেখাচ্ছে অনেক বেশি। গরমের মধ্যেও তিনি হলুদ রঙের কোট গায়ে দিয়ে আছেন।

ভদ্রলোকের গলার স্বর মেয়েদের মতো, তিনি শফিকুল করিমের দিকে তাকিয়ে প্রায় কিশোরীদের মতো গলায় বললেন, আপনার কী ব্যাপার?

—আমার নাম শফিকুল করিম। আমি চাকরিতে জয়েন করতে এসেছি।

—বুঝেছি। বসেন। কেমন আছেন?

—ভাল।

—স্যার আপনার কথা বলেছেন। কবে জয়েন করবেন সেটা বলেন নাই। আসছেন ভাল করেছেন। আজ দিন ভাল— বৃহস্পতিবার। চা খাবেন?

—জি না।

—প্রথম দেখা আপনার সঙ্গে। চা খান। আলাপ পরিচয় হোক।

—আপনার এইখানে কি সিগারেট খাওয়া যাবে?

—যাবে। সিগারেট ধরান কোন সমস্যা নাই।

http://Doridro.com

দিয়ে বাতাস করছিল?

—ম্যাডাম আন্তরিকভাবে গল্পগুজব করছিলেন। বাবার সঙ্গে ঠাট্টাতামাশাও করছিলেন। যেন আমরা তাঁর খুবই পরিচিত।

—কী ঠাট্টাতামাশা করছিল একটু বলো তো শুনি।

—আমি বলতে পারব না স্যার। যখন ঠাট্টাতামাশা করছিলেন তখন আমি বারান্দায় ছিলাম।

—বারান্দায় ছিলে কেন?

—আমার সিগারেট খাবার অভ্যাস আছে আমি সিগারেট খাবার জন্য বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

—তুমি বারান্দায় ছিলে না তাহলে কী করে বুঝলে যে ঠাট্টাতামাশা হচ্ছিল?

—আমি ওনাদের হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

—লায়লাও হাসছিল?

—জ্বি স্যার।

—কী নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছিল এটা তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে না?

—জানা যাবে।

—সোবাহানকে বলো একটা গাড়ি পাঠিয়ে সে যেন তোমার বাবাকে আমার এখানে নিয়ে আসে। রাত নটার দিকে আনবে।

—জ্বি আচ্ছা স্যার।

—তোমার কপাল ঘেমে গেছে। ঘর যথেষ্ট ঠাণ্ডা, তোমার কপাল ঘামছে কেন?

শফিক জবাব দিতে পারল না। তাঁর কি হার্ট অ্যাটাকের মতো হচ্ছে? হার্ট অ্যাটাকে অনেক সময় ঘাম হয়।

বড় সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা তুমি এখন যাও। আমজাদ আলির শাস্তি কোন পর্যায়ে আছে খোঁজ নাও।

শফিক দোতলা থেকে নীচে নেমে এল।

আমজাদ আলি উঠবোস করছেন। হাঁ করে নিঃশ্বাসে নিচ্ছেন। বুক উঠানামা করছে। তাঁর পরনের ছাই রঙের পাঞ্জাবির পুরোটাই ঘামে ভিজে জবজব করছে। আগে উঠবোস করার সময় স্ট্যান্ড ফ্যানে বাতাস দেয়া হত। আজ বাতাস দেয়া হচ্ছে না। মনে হয় ফ্যান নষ্ট। আমজাদ আলির বয়সও মনে হয় কয়েকদিনে অনেক বেড়েছে। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। চোখের নীচে কালি।

শফিক তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি উঠবোস বন্ধ করে পাশের চেয়ারে বসলেন।

যে উঠবোসের হিসাব লিখছিল সে বলল, স্যার আরও করবেন, না এই পর্যন্ত।

আমজাদ আলি বললেন, আজ আর পারব না। কত হয়েছে? টোটাল কত?

—তিন হাজার ছয়শো একত্রিশ।

—এত কম? এই জীবনে মনে হয় শেষ করতে পারব না।

—বাসায় চলে যান। কয়েকটা দিন রেস্ট নেন। একসঙ্গে বেশি করা ঠিক হবে না।

আমজাদ আলি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ভাই দেখ তো একটু চা খাওয়াতে পার কিনা।

তিনি হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। মুখের হাঁ একবারও বন্ধ করছেন না। অফিসের বারান্দায় এখন কেউ নেই শুধু শফিক এবং আমজাজ আলি। আমজাদ আলি চেয়ারে গা ছেড়ে এলিয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে যে-কোনও সময় গড়িয়ে নীচে পড়ে যাবেন। শফিক তাঁর সামনে রাখা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে।

আমজাদ আলি বললেন, ভাই কিছু বলবেন?

শফিক বলল, জ্বি না।

—কত বড় বিপদে পড়েছি দেখেছেন ভাই সাহেব। নিঃশ্বাস ঠিকমতা নিতে পারছি না।

শফিক বলল, আপনি একটা কাজ করুন, ঘরের ভেতরে ফ্যানের নীচে বসুন।

—এখন নড়তে পারব না। নড়ার ক্ষমতা নাই। পায়ের অবস্থা দেখেন। কী রকম ফুলেছে দেখেছেন? মনে হয় পানি এসে গেছে। আঙুল দিয়ে চাপ দিলে ডেবে যায়।

আমজাদ আলির চা চলে এসেছে। তিনি চায়ের কাপ হাতে নিয়েই বমি করতে শুরু করলেন। শফিক ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরল। আমজাদ আলি বিড়বিড় করে বললেন, সরি আপনার কাপড় নষ্ট করে দিয়েছি।

আমজাদ সাহেবকে হাসপাতালে নিতে হল। ডাক্তাররা দেখেশুনে বললেন, তেমন কিছু না। বাসায় নিয়ে যান রোগী রেস্টে থাকুক। সাত দিন কমপ্লিট বেড রেস্ট।

শফিক বলল, চলুন আপনাকে বাসায় দিয়ে আসি।

আমজাদ আলি বললেন, আমাকে বাসায় দিয়ে আসতে হবে না। আমি একটা ইয়েলো ক্যাব নিয়ে চলে যাব। আপনি অনেক কষ্ট করেছেন, আর না।

শফিক বলল, কষ্ট কিছু না, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

—সেটা জানি রে ভাই। স্যার আপনাকে ফুলটাইম গাড়ি দিয়েছেন। আপনি বিরাট ভাগ্যবান মানুষ। একদিন দুটা মিনিট সময় দিবেন, আমি আমার কপালটা আপনার কপালে ঘষব।

যাবার পথে আমজাদ গাড়ির পেছনের সিটে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইলেন। চলন্ত গাড়িতে তিনি মাথা তুলতে পারছেন না। মাথা ঘুরছে। একবার শুধু শফিককে ফিসফিস করে বললেন, কানে ধরে উঠবোসের ব্যাপারটা যেন কেউ না জানে। ভাই আপনার পায়ে ধরি।

শফিক বলল, কেউ জানবে না।

আমজাদ আলি বললেন, আমার ছোটমেয়েকে তো চিনবেন না। শায়লা নাম। তার বিরাট বুদ্ধি। প্যাঁচ খেলিয়ে বের করে ফেলবে।

বাসায় পা দিয়েই আমজাদ সাহেব পুরোপুরি সুস্থ। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি।

মা, দেখ কাকে নিয়ে এসেছি। আমাদের নতুন কলিগ। চা নাশতার জোগাড় দেখ গো মা।

শফিককে চা নাশতা খেতে হল। আমজাদ সাহেবের ছোট মেয়ে শায়লার দুটো গান শুনতে হল। শায়লা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে। আমজাদ আলির বাড়িতে যে অতিথিই আসুক শায়লার একটা গান শুনতে হয়। এখন পর্যন্ত সে একটা গানই পুরোপুরি তুলেছে—"খোল খোল দ্বার, রাখিও না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।"

আমজাদ আলি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মেয়ের গলাটা আপনার কাছে কেমন লাগল?

শফিক বলল, খুবই সুন্দর গলা।

—আজ তবলা ছাড়া শুনেছেন। তবলা দিয়ে শুনলে আরও ভাল লাগবে। আরেকদিন যদি আসেন তবলা দিয়ে শোনার ব্যবস্থা করব।

—আসব আরেক দিন।

আমজাদ আলি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন, মাগো তোমার এই গান আরেকবার শুনাও। এইসব গান একবার শুনলে মন ভরে না।

শফিককে একই গান দ্বিতীয় বার শুনতে হল।

শফিক বাসায় ফিরল রাত দশটায়। নিশো তখনও জেগে। সে শফিককে দেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। নিশো আনন্দিত এবং উত্তেজিত। তার গায়ে নতুন জামা। তার খুব পছন্দের সাজ ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়া। এটা তাকে কখনও করতে দেওয়া হয় না। বিশেষ বিশেষ উৎসবে এই সুযোগটা সে পায়। আজ পেয়েছে। সে ইচ্ছা মতো ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষেছে।

নিশো বলল, বাবা আজ বাসায় পোলাও রান্না হয়েছে।

—হটাৎ পোলাও কেন?

—আজ মা'র জন্মদিন।

http://Doridro.com

—ও আচ্ছা তাই তো!

মীরার জন্মদিনের তারিখটা শফিকের কখনও মনে থাকে না। বড় সাহেবের মতো তার যদি কয়েকজন পার্সোনাল ম্যানেজার থাকত তা হলে একজনের উপর দায়িত্ব থাকত জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, মেয়ের জন্মদিন এইসব মনে করিয়ে দেওয়ার। একজনের উপরে দায়িত্ব থাকত কী উৎসব বিবেচনা করে উপহার কিনে আনার। আর একজন থাকত ফুড ম্যানেজার। সে উপলক্ষ বিবেচনা করে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করবে।

মীরা সুন্দর করে সেজেছে। চোখে কাজল দিয়েছে। কাজল নামের কালো রঙ কী করে চোখ এত সুন্দর করে কে জানে! মেয়েরা উৎসব উপলক্ষে নতুন শাড়ি পরতে পছন্দ করে। বেচারি একটা পুরনো শাড়ি পরেছে। জন্মদিনের কথার শফিকের কিছুই মনে নেই। মনে থাকলে একটা সুতির শাড়ি সে অবশ্যই কিনত। একটা শাড়ি, কিছু ফুল।

মীরা বলল, গোসল করার আগে কি তোমাকে চা দেব? না, গোসল করে চা খাবে?

—আগে গোসল করব।

—আমার জন্মদিনের কথা তুমি ভুলে গেছ, তাই না।

—না ভুলিনি।

—কেন মিথ্যা কথা বলো। ভুলে গেছ সেটা স্বীকার করলেই হয়। আমার জন্মদিন এমন কোনও বিরাট ব্যাপার না যে তোমাকে মনে রাখতে হবে।

—ঝগড়া শুরু করে দিলে?

—ঝগড়া শুরু করব কেন? তুমি যে মিথ্যা কথা বলছ এটা শুধু ধরিয়ে দিলাম। তোমার যদি জন্মদিনটা মনে থাকত—আর কিছু আনো না আনো কিছু ফুল আনতে।

—ফুল আনলেই ভালবাসা প্রমাণ হয়?

—ফুল আনলে প্রমাণ হয় যে তারিখটা তোমার মনে আছে।

—তোমার জন্মতারিখটা খোদাই করে আমার কপালে লিখে দাও না কেন? যতবার আয়নার দিকে তাকাব ততবার জন্মতারিখ মনে পড়বে।

—এখন তুমি ঝগড়া শুরু করেছ। যাও গোসল করে আসো। আজকের দিনটা চিৎকার চেঁচামেচি না করে পরে করো। প্লিজ হাতজোড় করছি।

শফিক গোসল করছে। মা মেয়ে দুজনই বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে। আজ বৃষ্টি নেই, বৃষ্টির পানির ধারাস্রোত নেই—কিন্তু শফিক গোসলের সময় এমন ভাব করছে যেন তার মাথায় বৃষ্টির পানি পড়ছে। মীরা ব্যাপারটা আগ্রহ নিয়ে দেখছে। এই অদ্ভুত কাণ্ড শফিক আগেও কয়েকবার করেছে। কাজটা সে নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করে করছে না। সে কি কোনও ঘোরের মধ্যে আছে?

নিশো বলল, বাবা আজ পোলাও এর সঙ্গে কী রান্না হচ্ছে বল তো?

শফিক বলল, জানি না।

—আন্দাজু করো। (আন্দাজকে নিশো আন্দাজু বলে।)

—আন্দাজু করতে পারছি না।

—চেষ্টা করো।

—চেষ্টা করতে পারছি না। বিরক্ত করো না তো নিশো।

মীরা বলল, আমার রাগটা তুমি মেয়ের উপর দেখাচ্ছ কেন? তোমার সমস্যা কী?

শফিক কঠিন কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলল না। নিজেকে সামলে নিল। এখন সে চোখ বন্ধ করে এমনভাবে মাথা নাড়ছে যেন মাথার উপর বৃষ্টির পানি পড়ছে।

মীরা বলল, বৃষ্টির মধ্যে তুমি যখন গোসল করো তখন চা খেতে পছন্দ করো। এনে দেব এক কাপ চা?

—দাও।

—চা খেয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা করো। প্লিজ।

মীরা চা আনতে গেল। নিশো বলল, বাবা এখন আন্দাজু করো পোলাওয়ের সঙ্গে কী রান্না হয়েছে?

—হরিণের মাংসের কাবাব। ময়ূরের রোস্ট।

—হয়নি।

—তাহলে মনে হয় হাতির মাংসের রেজালা, ঘোড়ার মাংসের কোরমা।

—বাবা তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ। ভাল হবে না বলছি। আমিও কিন্তু মা'র মতো রাগ করব।

শফিক হেসে ফেলল। মীরার উপর যে রাগ তৈরি হয়েছিল এখন আর তা নেই। হেসে ফেলায় সব শেষ। এখন শফিকের ইচ্ছা করছে মীরাকে সত্যি কথাটা বলতে। সে এখন মীরাকে বলতে পারে তোমার জন্মদিনের তারিখটা আমি ভুলে গেছি এটা সত্যি, তবে আমাদের অফিসের একজন কর্মচারির হার্ট অ্যাটাকের মতো হয়েছিল এটাও সত্যি।

মীরা চা এনে দেখে, বাবা মেয়ে দুজনই খুব হাসাহাসি করছে। শফিক হাত দিয়ে পানি ছিটাচ্ছে আর মেয়ে বলছে— বাবা ভাল হবে না বলছি। আমি কিন্তু খুব রাগ করছি। আমি কিন্তু ভয়ংকর রেগে যাচ্ছি।

জয়নাল সাহেব অবাক হয়ে তাঁর সামনে বসে থাকা মানুষটাকে দেখছেন। এই মানুষটা নাকি কোটিপতির উপর কোটিপতি। তিনি তাঁর জীবনে কোনও কোটিপতি দেখেননি। এক লক্ষ লিখতে একের পর পাঁচটা শূন্য দিতে হয়। এক কোটি লিখতে কয়টা শূন্য লাগে তিনি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছেন না। নিযুতের পর হল কোটি। নিযুত লিখতে ছয়টা শূন্য, তার মানে সাতটা শূন্য। এক বিলিয়নে কয়টা শূন্য? যাক এইসব নিয়ে পরে চিন্তা করা যাবে এখন বরং কোটিপতি মানুষটাকে দেখা যাক।

মানুষটা চেয়ারে দুলছেন। বেশিক্ষণ দুলুনি দেখা যায় না। মাথা ঝিমঝিম করে। মানুষটা সিগারেট খাচ্ছেন। নিশ্চয়ই খুবই দামি সিগারেট। তিনি নিজে সিগারেট খান না, তবে দামি একটা সিগারেট খেয়ে দেখা যেতে পারে। তবে এই মানুষের সামনে খাওয়া যাবে না। বেয়াদবি হবে।

—আপনি ডিকশনারি মুখস্থ করে ফেলেছেন?

—জ্বি জনাব।

—আপনি যেখানেই যান হাতে ডিকশনারি থাকে?

—জ্বি জনাব।

—বাস করেন একটা হোটেলে?

—জ্বি জনাব।

—আপনি কি সুখে আছেন?

—জ্বি জনাব।

—রাতের খাওয়া খেয়েছেন?

—জ্বি না।

—আমার সঙ্গে রাতের খাওয়া খান। অসুবিধা আছে?

—জ্বি না জনাব।

—প্রতিটি বাক্য জনাব দিয়ে বলছেন কেন?

—আপনি নিষেধ করলে বলব না।

—আপনার স্মৃতিশক্তি কেমন?

—স্মৃতিশক্তি ভাল না জনাব।

—ভাল না বলছেন কেন? গোটা ডিকশনারি মুখস্থ করে ফেলেছেন।

—আমার স্মৃতিশক্তি ভাল না জনাব। সব ক্ষমতা ডিকশনারী মুখস্থ করতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলেছি।

—নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলেন সেটা মনে আছে?

—জ্বি জনাব মনে আছে।

—লায়লার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মনে আছে?

—জ্বি মনে আছে।

—দুপুরে খেয়েছিলেন মনে আছে?

—মনে আছে।

—আইটেম কী কী ছিল মনে আছে?

—আছে।

—তাহলে তো অনেক কিছুই মনে আছে। এখন বলুন, লায়লার সঙ্গে

http://Doridro.com

কত বড় বিপদে পড়েছি দেখছেন ভাইসাহেব

কী কী কথা হয়েছিল। কোনও কিছু বাদ দেবেন না। আপনারা দুজন মিলে হাসাহাসিও করছিলেন বলে শুনেছি। কী নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন সেটা আগে বলুন।

জয়নাল সাহেব বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছেন। তাঁর সামনে চেয়ারে বসে যে মানুষটা দোল খাচ্ছে তাকে এখন আর খুব স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে মানুষটার কোনও সমস্যা আছে। বড় কোনও সমস্যা।

মবিনুর রহমান বললেন, চুপ করে আছেন কেন বলুন।

—উনি তাঁর মেয়ের নানান কর্মকাণ্ডের কথা বলতে বলতে হাসছিলেন।

—উদাহরণ দিন। উদাহরণ না দিলে বুঝব না।

—যেমন তাঁর মেয়েটা কেজি থেকে ক্লাস ওয়ানে উঠবে। উনি তাঁর মেয়েকে স্কুলে যাবার জন্যে সাজিয়ে দিচ্ছেন। সাজাতে সাজাতে বললেন— মা আজ তুমি ক্লাস ওয়ানে উঠবে। মেয়েটা তখন গম্ভীর হয়ে বলল, উঠব তো বুঝলাম কিন্তু নামব কীভাবে?

মবিনুর রহমান বললেন, এই কথায় হাসির অংশ কোনটা। কই আমার তো হাসি আসছে না।

—আমি ঠিকমতো বলতে পারিনি। এই জন্যে আপনার হাসি আসেনি।

—মেয়েটার নাম কী?

—নাম জানি না।

—নাম জিজ্ঞেস করেননি?

—জ্বি না।

—জিজ্ঞেস করেননি কী জন্যে?

—জনাব আপনি যদি চান আমি জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

—আপনাকে কিছু জানতে হবে না। আপনি কি কখনও মানুষ খুন করেছেন?

—জ্বি না জনাব।

—কাউকে খুন করার ইচ্ছা কখনও হয়েছে?

—জ্বি না।

জয়নাল সাহেব ভীত চোখে তাকিয়ে আছেন। মানুষটাকে দেখে তাঁর কেমন জানি ভয় ভয় লাগছে। শফিকের জন্যে তাঁর মায়া লাগছে। এই মানুষটার সঙ্গে কাজ করা শফিকের জন্যে নিশ্চয়ই কোনও সহজ কাজ না। আহা বেচারা।

মবিনুর রহমান বললেন, মানুষ খুন না করতে পারেন কিন্তু খুনের ইচ্ছা হওয়াটাতো স্বাভাবিক। আমার বাবা আমার চার বৎসর বয়সে আমাকে একটা এতিমখানায় দিয়ে চলে যান। আর তাঁর কোনও খোঁজ পাইনি। এই মানুষটার প্রতি আমার কি রাগ উঠবে না?

জয়নাল সাহেব ভয়ে ভয়ে বললেন, উনি হয়তো খুবই অভাবী মানুষ ছিলেন। অভাব মানুষের সব ভাল গুণ নষ্ট করে দেয়। আমিও অভাবের কারণে আমার স্ত্রীকে মেয়ের বাসায় ফেলে রেখে হোটেলে থাকি।

মবিনুর রহমানের মুখ হাসিহাসি। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি মজা

http://Doridro.com

পাচ্ছেন। তিনি ডিকশনারি হাতে বসে থাকা লোকটার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললেন, এখন আমি কী বলব একটু মন দিয়ে শুনবেন।

জয়নাল সাহেব ভীত গলায় বললেন, আপনার সব কথাই আমি মন দিয়ে শুনছি জনাব।

—চার বছর বয়েসি বাচ্চার মনে কোনও স্মৃতি থাকে না। কিন্তু আমার বাবাকে নিয়ে কিছু স্মৃতি আছে। তার মধ্যে একটা হল আমার বাবা আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন। ঘাড়ে ধরে পুকুরের পানিতে মাথা ডুবিয়ে রাখছেন। আমার নাক মুখ দিয়ে পানি ঢুকে যাচ্ছে। এখন আপনি বলুন, এই মানুষটাকে খুন করার ইচ্ছা হওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক কিছু?

জয়নাল সাহেব বিড় বিড় করে বললেন, জনাব খুবই পানির পিপাসা হয়েছে। এক গ্লাস পানি খাব।

—বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা পানি?

—জ্বি জনাব বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা পানি।

জয়নাল সাহেবকে বিস্মিত করে দিয়ে এই মানুষটা নিজেই হাতে করে পানি নিয়ে এলেন। কোটিপতি একজন মানুষ। একের পর সাতটা শূন্য বসালে কোটি হয়। কোটির পরে কি আছে? বিলিয়নের পরে আছে ট্রিলিয়ন। কোটির পরে কি?

—জয়নাল সাহেব।

—জ্বি।

—আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

—সামান্য লাগছে। যদি ইজাজত দেন আমি হোটেল চলে যাই।

—ডিনার করবেন না?

—জ্বি না। শরীরটা ভাল না।

—আচ্ছা ঠিক আছে যান। গাড়ি আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে। আর এক দিন আপনাকে খবর দিয়ে আনব।

—আপনাকে সঙ্গে নিয়ে একটা দৃশ্য দেখব। তিন চার বয়েসী একটা বাচ্চা জোগাড় করব। বাচ্চার বাবাকে দিয়ে বাচ্চাটাকে শাস্তি দেওয়াব। বাচ্চাটার বাবা সামান্য কিছু সময়ের জন্যে বাচ্চাকে ঘাড়ে ধরে চৌবাচ্চার পানিতে চুবিয়ে রাখবে। ইন্টারেস্টিং হবে না?

জয়নাল সাহেব বিড় বিড় করে বললেন, জ্বি জনাব।

—আপনার সন্ধানে কি এই বয়সের কোনও ছেলে বা মেয়ে আছে?

—জয়নাল সাহেব আবারও বিড়বিড় করলেন। কী বললেন কিছুই বোঝা গেল না।

পাঁচ

মঞ্জু মামা চেয়ারে পা তুলে আয়েস করে বসে আছেন। তিনি সহজে যাবেন মীরার এক রকম মনে হচ্ছে না। সে শঙ্কিত বোধ করছে। রাত আটটা বাজে, যে কোনও সময় শফিক এসে উপস্থিত হবে। মঞ্জু মামাকে দেখে সে আহ্লাদিত বোধ করবে এ রকম মনে করার কোনও কারণ নেই। অথচ একটা সময় ছিল যখন শফিক তাকে পাঠাত মঞ্জু মামার কাছে। টাকা ধার করে আনতে। তখন কি শফিক জানত না প্রৌঢ় চিরকুমারদের সাধারণ যে সব ত্রুটি থাকে এই মানুষটির সে সব ত্রুটি আছে। ভাল মতোই আছে। টাকা দেবার সময় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করা কিংবা হঠাৎ গালে হাত দিয়ে বলা— 'তোর গালে এটা কি? ব্রণ না-কি?' 'কী সেন্ট মেখেছিস রে? সুন্দর গন্ধ তো' বলে নাক বুকের কাছাকাছি নিয়ে আসা। মানুষটার সাহস কম বলে মীরা অল্পেতে পার পেয়েছে। শফিক এইসব কিছুই জানে না। তার পরেও কিছু নিশ্চয়ই অনুমান করে।

মঞ্জু পান চিবুচ্ছেন। পানের রস ঠোঁট বেয়ে নিচে নামছে। তিনি ঝোলটানার মতো পানের রস টানছেন। এই কাজটা করতে গিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন বলেও মনে হচ্ছে। এক্ষুণি মানুষটাকে চলে যেতে বলা উচিত। ভদ্রভাবে এই কাজটা সে কি ভাবে করবে ভেবে পাচ্ছে না। মীরা বলল, মামা তুমি আমাদের কাছে কত টাকা পাও বল তো?

মঞ্জু হাঁটু দুলাতে দুলাতে বললেন, কেন, টাকাটা দিয়ে দিবি?

—দেব। নিশোর বাবা ঋণ শোধ করা শুরু করেছে।

—তোর কি ধারণা তোর কাছে টাকা ফেরত নিতে এসেছি?

—সে রকম ধারণা না। জানার জন্যে বললাম। এক সঙ্গে সব টাকা দিতে পারব না। ভাগ ভাগ করে দিতে হবে।

—তোদের মনে হয় অনেক টাকা হয়েছে।

—মামা ও বেতন ভাল পাচ্ছে।

—ভাল মানে কী? কত টাকা বেতন?

মীরা বলল, মাসে বিশ হাজার করে পাচ্ছে।

মীরা একটু বাড়িয়ে বলল। বেতন আসলে পনেরো হাজার। বিশ হাজার বলে তার ভাল লাগছে। এতই ভাল লাগছে যে চোখ ভিজে আসার মতো হয়ে যাচ্ছে। মঞ্জুর চোখে একটু যেন সন্দেহের ছায়া, বিশ হাজার টাকা বেতন? বলিস কি?

—অফিস থেকে তাকে একটা গাড়িও দিয়েছে। ফুলটাইম গাড়ি। আমাদের তো গ্যারেজ নেই। গাড়ি রাস্তায় থাকে। ড্রাইভার গাড়িতে ঘুমায়।

—সত্যি বলছিস?

—তোমার সঙ্গে মিথ্যা বলব কেন মামা?

—এখনও এক রুমের বাসায় পড়ে আছিস কেন? নতুন বাসা নে।

—বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছি। পছন্দ মতো পাচ্ছি না। আমাদের দরকার তিন রুমের ফ্ল্যাট। একটাতে আমরা থাকব। একটাতে শ্বশুর শাশুড়ি থাকবেন। আর একটা গেস্ট রুম।

—গেস্ট রুমটা সুন্দর করে সাজাবি। আমি এসে মাঝে মধ্যে থাকব।

—অবশ্যই থাকবে।

—তুই বললে আমি বাসা খুঁজে দিতে পারি।

—তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। ও কোম্পানি থেকে ফ্ল্যাট পাবে এ রকম সম্ভাবনাও আছে। ওই সব ফ্ল্যাট খুবই ভাল। ফার্নিশও। কোনও ফার্নিচার কিনতে হবে না। টিভি, মাইক্রোওয়েভ সব আছে।

—তোরা তো মনে হয় আলাদিনের চেরাগ পেয়ে গেছিস।

—একটু দোয়া কর মামা। বিয়ের পর থেকে বেচারা অনেক কষ্ট করেছে।

—প্রথম জীবনে কষ্ট করলে শেষ জীবনে আরাম হয়। এই আমাকে দেখ। কষ্টও তেমন করিনি, আরামও তেমন পাইনি। সারাটা জীবন সমান সমান পার করে দিলাম। শফিক আসবে কখন? তাকে কনগ্রাচুলেশান্স দিয়ে যেতাম।

—মামা ওর আসতে অনেক দেরি হবে।

—অসুবিধা নেই আমি বসি। আমার কাজকর্ম তো কিছুই নেই। এখানে বসে থাকাও যা, নিজের বাড়িতে বসে থাকাও তা। চা বানা, এক কাপ চা খাই। রং চা। পত্রিকায় পড়েছি রং চা হার্টের জন্যে ভাল।

মীরা লজ্জিতভঙ্গিতে বলল, চা আর একদিন খেও মামা। আমি এখন শাশুড়িকে দেখতে যাব। শুনেছি ওনার শরীর খারাপ করেছে।

—এত রাতে যাবি কী ভাবে?

—মামা আমি ব্যবস্থা করব। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

—আমি পৌঁছে দিয়ে যাই?

—মামা কোনও দরকার নেই।

মঞ্জু নিতান্তই অনিচ্ছার সঙ্গে উঠলেন। মীরার মনে হল তার মাথা থেকে বিরাট বোঝা নেমে গেছে। বেশ কিছুদিন থেকেই শফিকের মেজাজ খারাপ যাচ্ছে। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছে। নতুন ঝগড়া শুরু করার মতো সুযোগ তৈরি করা ঠিক হবে না। মঞ্জু মামা এসেছিল— এই ব্যাপারটা তাকে না জানালেই হবে। ছোট্ট সমস্যা একটা আছে। নিশো। সে কথায় কথায় বলে দিতে পারে। সে কি নিশোকে মঞ্জু মামার বিষয়ে কিছু বলতে নিষেধ করবে? তাকে নিষেধ করা মানে মনে করিয়ে দেওয়া। এমনিতে হয়তো কিছু বলবে না, নিষেধ করা হলেই বলবে।

মীরা নিশোর জামা বদলাতে গেল। নিশো বলল, আমরা কি কোনওখানে যাচ্ছি?

মীরা বলল, হ্যাঁ যাচ্ছি।

http://Doridro.com

—কোথায় যাচ্ছি মা? দাদিয়াকে দেখতে?

—প্রথমে দাদিয়াকে দেখতে যাব। সেখান থেকে যাব চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। তোমার বাবা আজ আমাদের বাইরে খাওয়াবে।

—কেন?

—আমরা অনেক দিন বাইরে খাই না তো এই জন্যে।

—মা আমরা কী অনেক বড় লোক হয়ে গেছি?

—হ্যাঁ হয়েছি।

—তাহলে আমাদের বাসায় ফ্রিজ নেই কেন?

—ফ্রিজের ব্যবস্থা হবে। সামনের মাসেই হবে। মা একটা কথা মন দিয়ে শোন— আজ যে মঞ্জু মামা আমাদের বাসায় এসেছিলেন এটা বাবাকে বলবে না।

—বলব না কেন?

—আমি নিষেধ করেছি এই জন্যে বলবে না। ছোট মেয়েদের মা'র কথা শুনতে হয়।

—আচ্ছা বলব না।

—প্রমিস?

—প্রমিস। বাবা কখন আসবে মা?

—এক্ষুণি চলে আসবে।

—এক্ষুণি মানে কখন?

—উফ মা। তুমি এত কথা বল কেন?

গাড়িতে চড়ে নিশো খুবই উত্তেজিত। সে চোখ বড় বড় করে বলল, বাবা এটা কি আমাদের নিজেদের গাড়ি?

মীরা বলল, এটা তোমার বাবার অফিসের গাড়ি।

নিশো বলল, এখন থেকে এই গাড়ি কি আমাদের সঙ্গে থাকবে?

মীরা বলল, আমাদের সঙ্গেই তো থাকে।

—স্কুলে যাবার সময় থাকে না কেন? স্কুলে আমি রিকশা করে যাই কেন?

—তোমার স্কুলে যাবার সময় তো গাড়ির দরকার নেই। যখন প্রয়োজন হবে তখন গাড়ি পাবে।

—কখন প্রয়োজন হবে?

—এই যেমন আজ প্রয়োজন হয়েছে। আমরা তোমার দাদিয়ার বাসায় বেড়াতে যাচ্ছি। সেখান থেকে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যাব।

—আমি কিন্তু স্যুপ খাব না।

—বেশ তো খাবে না। যেটা তোমার খেতে ইচ্ছা করবে খাবে।

নিশো তার বাবার দিকে ঝুঁকে এসে বলল, আমরা কি অনেক বড়লোক হয়ে গেছি বাবা?

শফিক জবাব দেবার আগেই মীরা বলল, এত কথা বলবে না তো মা। গাড়িতে এত কথা বলতে নেই।

—গাড়িতে 'এত কথা' বললে কী হয়?

মীরা বলল, এসি গাড়ি। দরজা জানালা বন্ধ। কথা বললে কথা কানে বেশি বাজে। মাথা ধরে।

—আমার তো মাথা ধরেনি।

—আমাদের ধরেছে। আমার ধরেছে। তোমার বাবার ধরেছে।

—আচ্ছা তাহলে আর কথা বলব না।

নিশো চুপ করে গেল। শফিক বলল, তোমার মেয়ে তো কথাকুমারী হয়ে গেছে। সুন্দর গুছিয়ে কথা বলা শিখেছে।

মীরা বলল, গুছিয়ে কথা বলার জন্যে ও যে সিনেমায় অফার পেয়েছে সেটা তো তোমাকে বলা হয়নি।

শফিক বলল, সিনেমায় অফার পেয়েছে মানে কী?

—আমরা গার্জিয়ানরা তো স্কুলের বাইরে অপেক্ষা করি। একজন গার্জিয়ান গত সোমবার আমাকে বললেন, আপনার মেয়ে দেখতে খুবই সুন্দর। কুট কুট করে কথা বলে, তাকে কি সিনেমায় দেবেন? ওই ভদ্রমহিলার ভাই ফিল্ম মেকার। তিনি এখন ছবি বানাচ্ছেন— ছবির নাম ঝরা বকুল। তিনি একজন শিশুশিল্পী খুঁজছেন যে ঝরা বকুলের নায়িকার বোন। নায়িকার সঙ্গে তার একটা গান আছে।

—তুমি কী বলেছ?

—বলাবলির কী আছে? আমার মেয়ে সিনেমা করবে না-কি!

শফিক হালকা গলায় বলল, শুনে তো আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে।

—তুমি কি চাও মেয়ে সিনেমা করুক? তুমি চাইলে আমি ওনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি।

শফিক জবাব দিল না। নিশো মা'র পাশে জানালার দিকে বসেছিল, সেখান থেকে উঠে এসে বাবার কোলে বসল।

মীরা বলল, আজ আমার খাটনি অনেক বাঁচল।

শফিক বলল, খাটনি বাঁচল মানে কী?

—সেজেগুজে বের হয়েছি। তোমার জন্যে নিশিরাতে সাজতে বসতে হবে না।

শফিক বলল, সাজতে ভাল লাগে না? আমার তো ধারণা সব মেয়ে সাজতে পছন্দ করে।

মীরা বলল, আমিও সাজতে পছন্দ করি। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে সাজছি ভাবতে ভাল লাগে না।

—আচ্ছা আর সাজতে বলব না।

মীরা বলল, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, তুমি না বললেও আমি সাজব।

নিশো বলল, মা তুমি আমাকে কথা বলতে নিষেধ করেছ, আমি কথা বলা বন্ধ করেছি। তুমি কিন্তু কথা বলেই যাচ্ছ। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

মীরা বলল, এটা ঠিক হচ্ছে না। আমরা আর কথা বলব না।

—চাইনিজ রেস্টুরেন্টে তো কথা বলতে কোনও সমস্যা নেই। তাই না মা?

http://Doridro.com

—না সেখানে কোনও সমস্যা নেই।

—আমি কিন্তু স্যুপ খাব না মা।

—একবার তো বলেছ স্যুপ খাবে না বার বার বলার দরকার নেই। আমার মনে আছে।

শফিক বলল, প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। আজ আর মাকে দেখতে যাবার দরকার নেই। চল সরাসরি রেস্টুরেন্টে যাই।

মীরা বলল, তুমি যা বলবে তাই হবে। তবে মাকে দেখতে গেলে মা খুশি হতেন।

শফিক ছয় মাস পর এই প্রথম সবাইকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে এসেছে। প্রতিজ্ঞা করেই এসেছে সে হাসিখুশি থাকবে। উঁচু গলায় কথা বলবে না। মেজাজ থাকবে পুরো কনট্রোলে। এই প্রতিজ্ঞার পেছনের কারণ হল যতবারই সে রেস্টুরেন্টে খেতে এসেছে মীরার সঙ্গে কোনও একটা ঝামেলা হয়েছে। মীরা মাঝপথে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আজ তার জন্মদিন উপলক্ষের খাওয়া। এতে কোনও ঝামেলা হওয়া উচিত না। শফিককে অনেক সাবধান থাকতে হবে।

আজও মনে হয় ঝামেলা হবে। আজকের সমস্যা শুরু করেছে নিশো। সে বলেছিল স্যুপ খাবে না। এখন সে এক বাটি স্যুপ নিয়েছে। স্যুপ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। মুখে দিচ্ছে না। শফিক এবং মীরার স্যুপের বাটি শেষ হয়েছে। শফিক যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুধার্ত। খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছু মুখে দিতে পারছে না। কারণ নিশো ঘোষণা করেছে তাকে বাদ দিয়ে কেউ অন্য কিছু খেতে পারবে না। সে যখন স্যুপ শেষ করে রাইস নেবে তখন অন্যরা নেবে। তার আগে না।

শফিকের মেজাজ যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। সে কিছু বলছে না। একটা সিগারেট ধরালে কিছু সময় পার করা যেত। সিগারেট ধরানো যাচ্ছে না— তারা বসেছে নো স্মোকিং জোনে। শফিক যখন ঠিক করল বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টেনে আসবে তখনই তার পকেটের মোবাইল বাজল। মবিনুর রহমান টেলিফোন করেছেন।

শফিক বলল, স্যার। স্লামালিকুম স্যার।

—আজ সারাদিন তোমার দেখা পাইনি, কী ব্যাপার বল তো?

—স্যার আমি নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলাম।

—কেন?

—লায়লা ম্যাডাম আমাকে যেতে বলেছিলাম। ওনার কাছে আমার মোবাইল নাম্বার দিয়ে এসেছিলাম। উনি টেলিফোন করেছিলেন।

—বাবুল কয়টা বাজে বল তো?

— স্যার নয়টা চল্লিশ বাজে।

—রাত তাহলে বেশি হয়নি। আমি ভেবেছিলাম দশটা সাড়ে দশটা বাজে।

—স্যার নয়টা চল্লিশ বাজে।

—তাহলে একটা কাজ কর। চলে আস।

—জ্বি আচ্ছা স্যার।

—কতক্ষণে আসতে পারবে?

—স্যার আমি খেতে বসেছি। খাওয়া শেষ করেই চলে আসব।

শফিক টেলিফোন পকেটে রাখতে রাখতে চাপা গলায় বলল, কার্টুন বুড়া।

নিশো কৌতূহলী হয়ে বাবার দিকে তাকাল। কিছু বলল না। মীরা বলল, তোমার স্যার টেলিফোন করেছেন?

শফিক থমথমে গলায় বলল, হুঁ।

—যেতে বলেছেন?

—হুঁ।

—কেন?

—তোমার জানার দরকার কী? এত কৌতূহল কেন?

—ওনাকে গালাগালি করছিলে কেন? বাচ্চাদের সামনে গালাগালি করা ঠিক না। বাচ্চারা এইসব দেখে শিখবে।

—কার্টুনটাকে কার্টুন বলব না তো কী বলব? দুলাভাই বলে কোলে বসিয়ে রাখব?

—এইসব কী? এই ধরনের কথা কী তোমার মুখে মানায়? ছিঃ।

—ছিঃ ছিঃ করবে না। একটা স্পাইনলেস জেলি ফিস। সারাক্ষণ মাথা দুলাচ্ছে, থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিতে পারলে...

মীরা সহজ গলায় বলল, তুমি ওনাকে একেবারেই পছন্দ কর না। কেন কর না সেটা তুমি জান। May be ওনার প্রচুর আছে, তোমার কিছুই নেই, এই হীনম্মন্যতা থেকে অপছন্দটা এসেছে। আমার কাছে কিন্তু মানুষটাকে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

শফিক বলল, ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে কেন? তুমি তাকে দেখেছ? না-কি তার সঙ্গে কথা বলেছ?

—আমি তাকে দেখিনি, কথাও বলিনি। যা শোনার তোমার কাছে শুনেছি।

—আমার কাছে শুনেই ধারণা হয়ে গেল উনি খুবই ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। কী এমন আমি বলেছি?

মীরা বলল, রেগে যাচ্ছ কেন? এসো ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলি। রেগে যাবার মতো কিছু হয়নি।

শফিক বলল, ঠিক আছে রাগছি না। ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছি। আমাকে এক্সপ্লেন কর কী করে তোমার ধারণা হল— ওই বুড়া ইঁদুর মারাত্মক ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে।

মীরা নরম গলায় বলল, যারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে তারা কখনও অর্থ উপার্জন বন্ধ করতে পারে না। কখনও অবসর নিতে পারে না। অথচ এই মানুষটা একটা পর্যায়ে এসে অর্থ উপার্জন বন্ধ করেছেন। অবসরজীবন যাপন করছেন। তাঁর মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে বিয়ে হয়েছিল, সেই স্ত্রীকে তিনি ভুলে যাননি। মাঝে মাঝে ঝুড়ি ভর্তি আম পাঠান। আমি কি ভুল বলছি?

—ভুল বলছ না। সবই শুদ্ধ বলছ। সমস্যা হচ্ছে বেশি শুদ্ধ বলছ।

—তুমি মানুষটাকে গোড়া থেকেই অপছন্দ কর বলে উনি যাই করেন তোমার খারাপ লাগে। তোমার জায়গায় আমি হলে কী করতাম জান? আমি মানুষটাকে বোঝার চেষ্টা করতাম।

শফিক কঠিন গলায় বলল, এক কাজ করি আমি চাকরি ছেড়ে দিই। তুমি চাকরিটা নাও। বুড়োকে বোঝার চেষ্টা কর। বুড়ো আমার মতো হবে না। তোমাকে রাতে সাজতে বলবে না। বিনা সাজেই বিছানায় নিয়ে যাবে। পাশাপাশি ঘুমুলে তাকে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। দ্রুত বুঝে ফেলতে পারবে। তারপর একটা বইও লিখে ফেলতে পারবে— মবিনুর রহমানের সঙ্গে সাত রাত।

মীরা চুপ করে গেল। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। এখন তার প্রধান চেষ্টা চোখের পানি আটকানো।

নিশো বলল, বাবা তোমাদের ঝগড়া কি শেষ হয়েছে? ঝগড়া শেষ হলে এসো আমরা খাওয়া শুরু করি। আমি এই স্যুপ আর খাব না।

শফিক ঠিক মতোই খেল। মীরা খেতে পারল না। চামচ দিয়ে সে শুধু খাবার নাড়াচাড়া করল।

শফিক বলল, খেতে না চাইলে খাবে না। চামচ নিয়ে টুং টাং জলতরঙ্গ বাজানোর কিছু নেই।

মীরা প্লেটে চামচ রেখে চোখ মুছল। সে মোটামুটি নিশ্চিত ছিল আজ কোনও ঝগড়া হবে না। সময়টা আনন্দে কাটবে। সুন্দর উৎসবের কী অদ্ভুত সমাপ্তি!

মবিনুর রহমান চাদর গায়ে বসে আছেন। তাঁর ধারণা জ্বর এসেছে। থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপা হয়েছে। জ্বর পাওয়া যায়নি। বরং দেখা গেছে গায়ের তাপ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু নীচে। হয়তো এটাও খারাপ। তাঁর সামান্য শ্বাসকষ্টও হচ্ছে। এই সমস্যা আগেও ছিল। শরীর খারাপ করলে কিংবা কোনও কারণে অস্থিরবোধ করলেই শ্বাসকষ্ট হয়। ডাক্তারদের ধারণা ব্যাপারটা মানসিক। শ্বাসকষ্ট না-কি সাইকোসমেটিক ডিজিজ। কোনও কারণে মনে চাপ পড়লে শ্বাস কষ্ট হয়।

http://Doridro.com

তার ধারণা ডাক্তারদের কথা ঠিক না। শ্বাসকষ্টের সমস্যাটা হচ্ছে দুর্বল ফুসফুসের কারণে। ছোটবেলায় অনেকবার তাঁর ফুসফুসে পানি ঢুকেছে। ফুসফুস তখনই নষ্ট হয়েছে।

মবিনুর রহমানের হাতে পানির গ্লাস। তিনি কিছুক্ষণ পর পর বরফ শীতল পানিতে চুমুক দিচ্ছেন, শ্বাসকষ্ট তখন কিছু কম হচ্ছে। এই বিষয়টা ডাক্তারকে বলতে হবে।

শফিক তাঁর সামনে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে চিন্তিত বোধ করছে। কী নিয়ে চিন্তা করছে জানতে পারলে ভাল হত। ভবিষ্যতের মানুষ এমন কোনও যন্ত্র কী বের করতে পারবে যা দিয়ে মনের কথা বোঝা যায়? যত টাকাই লাগুক এ রকম একটা যন্ত্র তিনি কিনতেন। যন্ত্র কানে লাগিয়ে বসে থাকতেন। তাঁর সামনে লোকজন আসত-যেত। তিনি কারও সঙ্গেই কোনও কথা বলতেন না।

—শফিক।

—জ্বি স্যার।

—এখন বল, লায়লা তোমাকে কী জন্যে ডেকেছিল।

—তিনি আমার বাবার জন্যে কিছু খাবার দিয়ে দিলেন।

—কী খাবার?

—শিং মাছের ডিম। ওইদিন বাবা কথায় কথায় বলেছিলেন তাঁর সবচেয়ে পছন্দের খাবার শিং মাছের ডিম। অনেকদিন তিনি এটা খান না। মাঝেমধ্যে খুব খেতে ইচ্ছা করে।

—লায়লা কি বলেছিল যে সে শিং মাছের ডিম রান্না করে খাওয়াবে?

—জ্বি না স্যার, বলেননি।

—সে শিং মাছের ডিম রান্না করে পাঠিয়ে দিল কেন? সে কেন বলল না তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে এসে পছন্দের খাবার খেয়ে যাও।

—জানি না স্যার।

—কারণটা তো খুব সহজ, তুমি জান না কেন?

—স্যার কারণটা সহজ হলেও আমি ধরতে পারছি না। আমার বুদ্ধি কম।

—কারণটা তোমাকে বলি, তোমার বাবাকে সে যদি দাওয়াত করে শিং মাছের ডিম খাওয়াতো তাহলে ব্যাপারটা হত, অনেক আইটেমে একটা পছন্দের আইটেম। আর এখন কী হল, শিং মাছের ডিমটা অনেক বেশি গুরুত্ব পেল। জিনিসটা রান্না হল নারায়ণগঞ্জে। একজন ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে জিনিসটা সংগ্রহ করে আবার ঢাকায় ফিরে গেল।

—স্যার, ম্যাডাম হয়তো এত চিন্তা করে কিছু করেননি।

—বাবুল শোনো, মানুষ আলাদাভাবে গালে হাত দিয়ে চিন্তাভাবনা করে কিছু বের করে না। চিন্তার ব্যাপারটা সব সময় হতে থাকে। বেশির ভাগ সময় মানুষ এটা বুঝতে পারে না। এখন বল তোমার পছন্দের খাবার কী?

—আমার আলাদাভাবে তেমন পছন্দের কোনও খাবার নেই।

—কয়টা বাজে?

—স্যার এগারোটা বাজে।

—আচ্ছা তুমি যাও।

শফিক ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা খেল। ধড়াম করে শব্দ হল। স্বাভাবিক রিফ্লেক্স অ্যাকশানে মানুষ শব্দের দিকে ফিরে তাকাবে। মবিনুর রহমান ফিরে তাকালেন না। মূর্তির মতো বসে রইলেন।

ছয়

শফিকের মা মনোয়ারা বেগম বাথরুমে পা পিছলে পড়ে মাথায় ব্যথা পেয়েছেন। আঘাত তেমন গুরুতর না। মাথা ফাটেনি। তবু তিনি চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলে ফেললেন। তাঁর বড় মেয়ে সুরমা এবং মেয়ের জামাই ফরিদ দৌড়ে এসে তাঁকে তুলতে গেল। তিনি মেয়ে জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি গায়ে হাত দিচ্ছ কেন? তুমি দূরে থাক।

ফরিদ বলল, মা আপনাকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেই?

তিনি হতভম্ব গলায় বললেন, শাশুড়ির গায়ে হাত দিবে এটা কেমন কথা।

—আপনার ছেলে এখানে থাকলে সে আপনাকে ধরত না?

মনোয়ারা বললেন, মুখে মুখে তর্ক করবে না। ছেলে আর মেয়ের জামাই এক না। তর্ক করা হয়েছে তোমার স্বভাব।

—আপনি বাথরুমে পড়ে থাকবেন?

—হ্যাঁ, বাথরুমে পড়ে থাকব, তুমি সামনে থেকে যাও।

সুরমা মাকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। মনোয়ারার পর্বতের মতো দেহ নড়ানোর সাধ্য তার নেই। মনোয়ারা মেয়েকেও ধমক দিলেন— ঢং করিস না। বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে এখনও ঢং ছাড়তে পারলি না?

সুরমা বলল, ঢং কী করলাম?

—হাত ধরে দড়ি টানাটানি খেলা খেলছিস, এর নাম ঢং। আমি দড়ি না।

—মুখের কাছে কমোড নিয়ে বাথরুমে পড়ে থাকবে?

—হ্যাঁ থাকব। তুই যা তোর জামাইকে কফি বানিয়ে খাওয়া। বাজার থেকে পেস্ট্রি এনে দুইজনে মিলে কেক পেস্ট্রি খা।

কেক-পেস্ট্রির ছোট্ট ইতিহাস আছে। গতকাল সন্ধ্যায় ফরিদের কিছু বন্ধুবান্ধব এসেছিল। তাদের জন্যে কেক পেস্ট্রি আনা হয়েছে। মনোয়ারাকে দেওয়া হয়নি, কারণ তাঁর ডায়াবেটিস ভয়াবহ পর্যায়ের। মনোয়ারা ব্যাপারটা মনে রেখেছেন। তিনি সহজে কিছু ভোলেন না।

সুরমা বলল, মা একটু চেষ্টা করে দেখ না নিজে নিজে উঠতে পার কিনা!

মনোয়ারা বললেন, উঠতে পারলে তো উঠেই যেতাম। মুখের কাছে গু নিয়ে শুয়ে থাকতাম না। তোর ইংরেজির মহাসাগর বাপকে খবর দে। সে এসে দেখুক কী অবস্থা। শফিককে খবর দে। মনে হয় না আমি বাঁচব।

—তোমার কিছু হয়নি মা।

—আমার কিছু হয় নাই, ঢং করার জন্যে বাথরুমে শুয়ে আছি? সামনে থেকে যা। তোর চেহারা যেমন বান্দরের মতো কথাবার্তাও বান্দরের মতো— কিচকিচ কিচকিচ। গলার আওয়াজ শুনলেই মাথা ধরে।

ঘটনা ঘটেছে দুপুরে, এখন প্রায় সন্ধ্যা, এখনও মনোয়ারা বাথরুমেই শুয়ে আছেন। ডাক্তার এসে দেখেছেন। বলে গেছেন মাথার সিটিস্ক্যান করালে ভাল। সিটিস্ক্যান মেশিন ঢাকায় নতুন এসেছে। ডাক্তাররা এখন কথায় কথায় সিটিস্ক্যান করাতে বলেন।

অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়া হয়েছে। এখনও এসে পৌঁছায়নি। অ্যাম্বুলেন্সের লোকজন স্ট্রেচারে করে তাঁকে বাথরুম থেকে নিয়ে যাবে। সুরমার মনে ক্ষীণ আশা মা তাতে আপত্তি করবেন না।

জয়নাল সাহেব খবর পেয়ে চলে এসেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার মতো মানসিক সাহস তিনি এখনও সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি। যতবারই মনোয়ারার সঙ্গে দেখা হয়েছে ততবারই তাঁকে ভয়াবহ অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে মনে হয় এই যে তিনি একা হোটেলে বাস করেন তার পিছনে আল্লাহপাকের খাস রহমত আছে। আল্লাহপাক সব কিছুই বিবেচনা করে এই ব্যবস্থা করেছেন।

সুরমা এসে বাবাকে বলল, বাবা তুমি এখনও বসার ঘরে বসে আছ। মার কাছে যাও।

তিনি বললেন, যাচ্ছি রে মা যাচ্ছি, একটু রেস্ট নিয়ে তারপর যাই। শফিককে খবর দিয়েছিস?

—খবর দিয়েছি।

—শফিকের জন্যে একটু অপেক্ষা করি, বাপবেটা একসঙ্গে যাই। আমাকে দেখলে তোর মা আবার 'ইয়ে' হয়ে যাবে।

সুরমা বলল, মা চেঁচামেচি করবে। তুমি চুপ করে শুনবে।

জয়নাল সাহেব হতাশ গলায় বললেন, অবশ্যই অবশ্যই। এক কাপ চা দে। চা খেয়ে তারপর যাই। জামাই কোথায়?

http://Doridro.com

—অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে গেছে।

জয়নাল সাহেব কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন। মনোয়ারা তাঁকে দেখে যেসব কথাবার্তা শুরু করবেন সেসব কথা জামাই বা পুত্রবধূ শ্রেণীর কারওই শোনা উচিত না।

সুরমা বলল, চা পরে খাবে আগে মার কাছে যাও।

মনোয়ারার মাথার নীচে একটা বালিশ দেওয়া হয়েছে, অনেক কায়দা করে একটা টেবিল ফ্যান লাগানো হয়েছে। টেবিল ফ্যানের সমস্যা হল একটু পরপর ফ্যান ঘুরে যাচ্ছে। সুরমার বড় মেয়ের দায়িত্ব হল ঘুরে যাওয়া ফ্যান ঠিক করে দেওয়া। মেয়েটার নাম রুনি। ক্লাস সেভেনে পড়ে। অতি ভাল মেয়ে। এই বয়সের একটা মেয়ে একনাগাড়ে এতক্ষণ বাথরুমে বসে থাকতে পারে না। সে শান্তভাবেই বসে আছে। এর মধ্যে মনোয়ারা তাঁর নাতনির গালে একটা চড়ও দিয়েছেন। সে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কেঁদে আবার চুপ হয়ে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জয়নাল সাহেব এসে রুনির পাশে বসলেন। মনোয়ারা স্বামীর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, তুমি ভাল আছ?

জয়নাল সাহেব হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন।

—তোমার কাছে একশোটা টাকা হবে?

—অবশ্যই হবে।

—তাহলে একটা কাজ কর, একশো টাকা নিয়ে ওষুধের দোকানে যাও, আমার জন্যে একশো টাকার ঘুমের ওষুধ কিনে আন।

—এক্ষুনি যাচ্ছি। ওষুধের নাম বল।

—নামধাম লাগবে না। ঘুমের ওষুধ হলেই হবে। এই ওষুধ আমি তোমার সামনে খাব। খেয়ে মরে যাব। স্বামীর ভাত খাওয়ার সৌভাগ্য আমার কপালে নাই। স্বামীর কিনে দেওয়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা গেছি। এটা বলার মধ্যে আনন্দ আছে না? বিরাট আনন্দ।

জয়নাল সাহেব অপ্রস্তুত চোখে রুনির দিকে তাকালেন। শুরুটাই এরকম, শেষ কীরকম হবে কে জানে! মনোয়ারার মুখ ছুটে গেলে সর্বনাশ।

মনোয়ারা বললেন, আমাকে মেয়ের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে হোটেলে বসে মচ্ছব কর। মেয়ে জামাই আমাকে কী চোখে দেখে কোনও দিন খোঁজ নিয়েছ?

জয়নাল সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, সুরমা তোমার খুবই যত্ন করে। ফরিদও অতি ভাল ছেলে।

মনোয়ারা বললেন, বিড়বিড় করে সাপের মন্ত্র কী পড়তেছ। যা বলার পরিষ্কার করে বল।

রুনি তার নানাকে চোখে ইশারা করল চুপ করে থাকতে। জয়নাল সাহেব চুপ করে গেলেন।

মনোয়ারা বললেন, খেয়ে না খেয়ে যে আছি এটা কি জান? দুপুরে পান কিনে খাব। একটা পানের দাম পঞ্চাশ পয়সা। পঞ্চাশ পয়সার জন্যে জনে জনে হাত পাততে হয়। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে এরা কেক পেস্ট্রি খায় একবার জিজ্ঞেসও করে না— আম্মা কেক খাবেন? বাড়িতে যখন কেউ কুত্তা পালে তার দিকেও এক টুকরা কেক বাড়ির মালিক ছুঁড়ে দেয়।

জয়নাল সাহেবের খুবই লজ্জা লাগছে। রুনির সামনে এইসব কথা। মেয়েটা কি লজ্জাই না পাচ্ছে! সুরমাও নিশ্চয়ই শুনছে। সে তেমন লজ্জা পাবে না। কারণ মার স্বভাব সে জানে। জয়নাল সাহেব নিচু গলায় বললেন, শান্ত হও। তোমার শরীরটা খারাপ।

মনোয়ারা বললেন, আমি শান্ত হব আর তোমরা সবাই অশান্ত থাকবে। হোটেলে যখন থাক তখন শান্ত থাক, না অশান্ত থাক?

—তোমার কথা বুঝলাম না।

—আমার কথা কীভাবে বুঝবে? আমার হল অশান্ত কথা। তুমি বুঝবে শান্ত কথা। শান্ত কথা তোমাকে কে বলে ঠিক করে বল তো? হোটেলে বাজারের মেয়েছেলে আসে? তোমার কী বাঁধা কেউ আছে? এইসব হোটেলে কী চলে তা আমি জানি।

জয়নাল সাহেব শরমে মরে যাচ্ছেন। বাচ্চা একটা মেয়ে পাশে বসে আছে, না জানি সে কী মনে করছে!

মনোয়ারা বললেন, এই যে ইংরেজিওয়ালা, এখন সব কথা মন দিয়ে শোন— আমি যদি এই বাড়িতে থাকি তাহলে এই বাথরুমে পড়ে থাকব। আমাকে বাথরুম থেকে তুলতে হলে হয় তুমি তোমার হোটেলে নিয়ে তুলবে আর নয় তোমার গুণধর ছেলেকে বলবে তার বাসায় নিয়ে তুলতে। ছেলে শুনেছি মহা তালেবর হয়েছে। গাড়ি করে ঘুরে বেড়ায়। মেলা বেতন। বউ কোলে নিয়ে এখন বসে থাকে। বুড়া মায়ের খোঁজ নাই।

জয়নাল সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, ব্যবস্থা হবে।

মনোয়ারা বললেন, ব্যবস্থা যেন আজকেই হয়। তোমার গুণধর ছেলেকে বলবে সে যেন আজই আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করে।

—বলব। অবশ্যই বলব। সে আসুক।

—আর তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে। তোমাকে আর হোটেলে থাকতে দেব না। হোটেলে থাকবে আর নটী মেয়েদের দুধ ছানাছানি করবে তা হবে না।

রুনি লজ্জা পেয়ে উঠে চলে গেল। জয়নাল সাহেব মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলেন কারণ আল্লাহপাক মেয়েটাকে উঠে চলে যাবার মতো বুদ্ধি দিয়েছেন।

রাত দশটায় শফিক মা এবং বাবাকে তার বাসায় নিয়ে এল। মনোয়ারার সিটিস্ক্যান করা হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে থাকলেই হবে।

মীরা তার শোওয়ার ঘর শ্বশুর শাশুড়িকে ছেড়ে দিয়েছে। তারা শুতে এসেছে বসার ঘরে। মীরা মেয়েকে নিয়ে মেঝেতে বিছানা পেতেছে। শফিক পা গুটিয়ে শুয়েছে লম্বা সোফায়। সারা দিন মীরার উপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে। শোওয়া মাত্রই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। শফিক নরম গলায় তাকে ডাকল।

মীরা বলল, কিছু চাও? চা খাবে।

শফিক বলল, না। কবিতা শুনবে?

মীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

শফিক বলল, এক সময় প্রচুর কবিতা মুখস্থ করেছিলাম। এখন বোধহয় কিছুই মনে নেই। দেখি চেষ্টা করে। করব চেষ্টা?

মীরা শোওয়া থেকে উঠে বসতে বসতে বলল, বল। মীরার চোখে পানি এসে গেছে। বিয়ের পর পর রোজ রাতে শফিক কবিতা বলত। কী আনন্দটাই না তখন লাগত। তারপর সব বন্ধ হয়ে গেছে। আজ কতদিন পর সে কবিতা শুনাতে চাচ্ছে। আহারে কি আনন্দ!

No. Mr. Lawence. It is not like that!
I don't mind telling you
I know a thing or two about love
Perhaps more than you do.
And what I brow is that you make it
Too nice. Too beautiful.
It is not like that. You know; You fake it.
It is really rather dull.

মীরা মাথা নিচু করে আছে। মাথা নিচু করে থাকার কারণে টপটপ করে চোখের পানি পড়ছে তার শাড়িতে। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার বলে এই অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্যটা শফিক দেখছে না।

মীরার খুব ইচ্ছা করছে শফিকের হাত ধরতে। সে ভরসা পাচ্ছে না। ইদানীং শফিকের মেজাজ খারাপ যাচ্ছে। হাত ধরলে হয়তো বলে বসবে— 'আহ্লাদি করবে না।' তখন মন খারাপ হবে।

—মীরা কবিতাটার মানে বুঝতে পেরেছ?

—না।

—মানে হচ্ছে— 'ভালবাসা নিয়ে তোমরা যে এত মাতামাতি কর— সেটা ঠিক না।'

মীরা বলল, তোমার ওই কবি ভালবাসা কী বুঝতেই পারেনি।

—তুমি বুঝেছ?

http://Doridro.com

—হ্যাঁ বুঝেছি।

—তাহলে বল ভালবাসা কী?

মীরা লাজুক গলায় বলল, ভালবাসা হচ্ছে মাঝরাতে তোমার হাত ধরে বসে থাকা।

—কই হাত ধরছ না তো!

মীরা হাত ধরল। আর তখনই শোওয়ার ঘর থেকে ঠকঠক শব্দ হতে থাকল। কেউ যেন ভারী কিছু দিয়ে মেঝেতে বাড়ি দিচ্ছে। মীরা চিন্তিত গলায় বলল, কী হচ্ছে?

শফিক বলল, মা তাঁর পুরনো খেলা খেলছেন।

—তার মানে?

—বাবাকে বিরক্ত করছেন। বাবা যাতে ঘুমাতে না পারেন সেই ব্যবস্থা হচ্ছে। মা সারা রাত ঠুক ঠুক করবেন। আগে অনেকবার দেখেছি।

—সারা রাত এ রকম চলবে?

শফিক হাই তুলতে তুলতে বলল, সারা রাতই চলার কথা। এস ঘুমোবার চেষ্টা করি।

শফিক সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল মীরা। ঠুক ঠুক শব্দ হয়েই যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্যে থমকে আবারও শুরু হচ্ছে জোরালোভাবে।

রাত তিনটেয় মবিনুর রহমানের ঘুম ভেঙেছে। এই সময়ে প্রায়ই তাঁর ঘুম ভাঙে। তাঁকে বাথরুমে যেতে হয়। আজকের ঘুম ভাঙার কারণ ভিন্ন। তিনি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

তিনি তাঁর নিজের বাড়ির বারান্দায় মরে পড়ে আছেন। একটা লেজ লম্বা হলুদ পাখি ঠুকরে ঠুকরে তাঁর বাঁ চোখটা তুলে নিয়েছে। মৃত মানুষের কোনও ব্যথাবোধ থাকে না। থাকার কথা না, অথচ স্বপ্নে তিনি বাঁ চোখে ব্যথা পাচ্ছেন। পাখিটা এক একবার ঠোক্কর দিচ্ছে, তিনি ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছেন। স্বপ্ন দ্রুত বদলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি দেখলেন পাখিটা হলুদ না— এটা আসলে একটা কাক। কাকের ঠোঁট স্বাভাবিকের তুলনায় লম্বা। চোখ উঠিয়ে নেওয়ায় যে গর্তটা হয়েছে, কাক সেই গর্তে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, বাঁ চোখ না থাকলেও তিনি কাকের ঠোঁট দেখতে পাচ্ছেন।

মবিনুর রহমান বিছানা থেকে নামলেন। বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে পানি দিলেন। দরজা খুলে বারান্দায় এলেন। বারান্দায় যেখানে তাঁর ডেডবডি পড়েছিল সেই জায়গাটা তার দেখার ইচ্ছা। বারান্দা অন্ধকার। সুইচ বোর্ডটা কোথায় তিনি মনে করতে পারলেন না। দেওয়াল হাতড়ালেই সুইচ বোর্ড খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি দেওয়াল হাতড়াতে শুরু করলেন। আর তখনই মনে হল বারান্দার শেষ মাথা থেকে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন আসছে! রাত তিনটেয় বারান্দায় কোনও লোক থাকার কথা না। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কে?

—স্যার আমি।

—তুমি কে?

—স্যার আমার নাম হরমুজ। আমি নাইট গার্ড।

—কাছে আস।

নাইট গার্ড তাঁর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। তার গায়ে খাকি পোশাক। হাতে টর্চ। পায়ে বুটজুতা।

—তুমি নাইট গার্ড?

—জ্বি স্যার।

—তোমার ডিউটি কোথায়?

—রাত বারোটা থেকে আমার ডিউটি বারান্দায়।

—এখন কয়টা বাজে?

—জানি না স্যার।

—এখন বাজে রাত তিনটা। তুমি তো বারান্দায় ছিলে না।

—নীচে পিসাব করতে গিয়েছিলাম স্যার।

—তোমার নাম যেন কী?

—হরমুজ।

—হরমুজ শোনো, তোমাকে এখন বারান্দায় থাকতে হবে না। নীচে থাক। বাবুর্চিকে ডেকে তুলে বল আমি চা খাব।

তিনি বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসলেন। এখন আর বারান্দা অন্ধকার না। খুবই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর ডেডবডি যে জায়গায় পড়ে ছিল সেই জায়গাটাও দেখা যাচ্ছে। তবে স্বপ্নের বারান্দার সঙ্গে বাস্তবের বারান্দার কোনও মিল নেই। স্বপ্নের বারান্দায় ছুঁচলো লোহার শিক ঘন ঘন বসানো ছিল। তাঁর বারান্দায় সেরকম কিছু নেই।

তাঁর ঘুম পাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে হয়তো। এই সময়ের নিয়ম দূরের বৃষ্টি এগিয়ে আসে। মৌসুমী হাওয়ার সময় খণ্ড খণ্ড বৃষ্টি হয় না। দেশ জুড়ে বৃষ্টি হয়।

—স্যার চা।

—টেবিলে রেখে চলে যাও।

—স্যারের কি শরীর ঠিক আছে?

—আমার শরীর ঠিক আছে। ঠাণ্ডা লাগছে, পাতলা একটা চাদর দিয়ে যাও। বারান্দায় গার্ডের কাজ যে করে তার নাম কী? নাম বলেছিল ভুলে গিয়েছি।

—স্যার গার্ডের নাম হরমুজ।

তিনি হরমুজ নাম মনে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন। হরমুজের সঙ্গে মিল রেখে কয়েকটা শব্দ বলতে হবে। তাহলেই নাম মাথার ভেতর গাঁথা হয়ে যাবে। হরমুজ তরমুজ। হরমুজ তরমুজ। হরমুজ তরমুজ।

বাবুর্চি তাঁর গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে দিয়েছে। খুবই যত্ন করে সে চাদরটা দিয়েছে। তিনি বুঝতে চেষ্টা করছেন এই যত্নটা কতটা সে মন থেকে করছে, আর কতটা চাকরির অংশ হিসেবে করছে।

—তোমার নাম তো মনসুর?

—জ্বি স্যার।

—এইসব খুঁটিনাটি জিনিস আমার মনে থাকে না। তোমারটা মনে আছে।

—জ্বি স্যার। স্যার আপনার পা ম্যাসেজ করে দিব?

—দাও, তার আগে মোবাইল টেলিফোনটা আন তো দেখি। আমার ম্যানেজারকে একটা টেলিফোন করি।

মনসুর টেলিফোন এনে দিল। মবিনুর রহমান টেলিফোন হাতে নিতে নিতে বললেন, তোমার কী মনে হয়— এত রাতে টেলিফোনে তার ঘুম ভাঙালে সে কি রাগ করবে?

—জ্বি না স্যার।

—রাগ করবে না কেন? আমি তার অন্নদাতা এই কারণে?

—জ্বি স্যার।

—অন্নদাতা হবার অনেক সুবিধা আছে তাই না মনসুর?

—জ্বি স্যার।

—তুমি তো ভালই ম্যাসাজ করতে পার, ঘুম এসে যাচ্ছে।

—জ্বি স্যার।

মবিনুর রহমান টেলিফোন হাতে বসে আছেন। বাবুলের ঘুম ভাঙাবেন কিনা এখনও বুঝতে পারছেন না। হয়তো ভাঙাবেন। হয়তো ভাঙাবেন না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনও আছে। এখন মনসুরের সঙ্গে কথা বলে আরাম পাচ্ছেন। সে যদিও জ্বি স্যার ছাড়া আর কিছুই বলছে না। এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার যে রাতে তার কোমল গলায় জ্বি স্যার শুনতে ভাল লাগছে।

—মনসুর।

—জ্বি স্যার।

—মানুষ হিসেবে আমাকে তোমার কেমন মনে হয়?

—আপনের মতো মানুষ স্যার আমি আমার এই জীবনে দেখি নাই।

—তুমি কি এই কথাটা আমাকে খুশি করার জন্য বলছ?

—জ্বি না স্যার। আমার বড় মেয়েটার চিকিৎসার সব খরচ আপনি দিয়েছিলেন। তারে আপনি ইন্ডিয়াতে পাঠায়েছিলেন।

http://Doridro.com

—লাভ তো হয় নাই। তোমার মেয়ে মারা গেছে।

—জ্বি স্যার।

—তোমার মেয়েটার নাম যেন কী ছিল? আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে বলতে হবে না দেখি আমি বলতে পারি কিনা, রুমা, তার নাম রুমা। হয়েছে?

—জ্বি স্যার।

—তুমি বলেছিলে তোমার মেয়ের মৃত্যুর পর তার মা পাগল হয়ে গিয়েছিল— এখন তার অবস্থা কী?

মনসুর জবাব দিল না। মাথা নিচু করে পা মালিশ করতে লাগল। মবিনুর রহমান নড়েচড়ে বসলেন। হালকা গলায় বললেন, আমি এক সময় শুনেছিলাম তুমি তোমার পাগল স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আবার বিবাহ করেছ। এটা কি সত্যি?

—জ্বি স্যার।

—তোমার মেয়ের মৃত্যু শোকে যে মেয়ে পাগল হয়ে গেছে তাকে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করাটা দুষ্ট লোকের লক্ষণ। তুমি যে দুষ্ট লোক এটা জান?

মনসুর জবাব দিল না। তার হাত কাঁপতে লাগল। মবিনুর রহমান ঘুম ঘুম গলায় বললেন, আমি অবশ্য আমার আশপাশে দুষ্ট লোক রাখতে পছন্দ করি। কেন করি জান?

—জ্বি না স্যার।

—আশপাশে দুষ্ট লোক দেখতে পেলে আমার মন ভাল থাকে। তখন আমার মনে হয় ওদের তুলনায় আমি তো অনেক ভাল। আমি যদি সাধুসন্ন্যাসীদের নিয়ে থাকতাম তাহলে নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে হত। মনসুর ঠিক বলেছি?

—জ্বি স্যার।

—তোমার পরিচিত কেউ আছে যে খুন করেছে? খুনের ব্যাপারটা প্রকাশ হয়নি বলে তার শাস্তি হয়নি। সেরকম কেউ থাকলে আমি তাকে একটা পার্মানেন্ট চাকরি দিতাম। তাকে সব সময় রাখতাম আমার আশপাশে। তোমার চেনাজানার মধ্যে এরকম কেউ আছে?

—জ্বি না স্যার।

—বৃষ্টি শুরু হয়েছে, না?

—জ্বি স্যার।

—আচ্ছা ঠিক আছে তুমি চলে যাও।

—আরেক কাপ চা এনে দিব স্যার?

—না। আমার ক্যাপটা এনে দাও। মাথায় ঠাণ্ডা লাগছে।

মাথায় ক্যাপ পরায় খুবই আরাম লাগছে। ঘুম ঘুম ভাব হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে আরামটা চলে যাবে। ঘুমন্ত শরীর আরাম টের পায় না। মবিনুর রহমান জেগে থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন। যখন ঘুম পায় অথচ ঘুমুতে ইচ্ছা করে না তখন জেগে যাবার জন্যে মবিনুর রহমান তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করেন। পদ্ধতির নাম— পত্রলেখা পদ্ধতি। তিনি মনে মনে চিঠি লেখেন। বেশির ভাগ চিঠি বাবুপুরা এতিমখানায় সুপারিনটেনডেনটকে লেখেন। এই মানুষটা মারা গেছেন। তাতে চিঠি লিখতে তার সমস্যা হয় না। হঠাৎ হঠাৎ লায়লাকে লেখেন। লায়লাকে চিঠি লেখার সময় তাঁর সামান্য লজ্জাবোধও হয়। লায়লাকে চিঠি লেখার সময় তিনি এমন ভাব করেন যেন লায়লা তাঁরই স্ত্রী। কোনও কারণে সে ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা বাস করছে। লায়লাকে লেখা চিঠিতে প্রেম ভালবাসা জাতীয় কিছু থাকে না। প্রয়োজনের চিঠির মতো হয়।

মবিনুর রহমান চোখ বন্ধ করে চিঠি শুরু করলেন,

লায়লা,

আমার ম্যানেজারকে দিয়ে কিছু আম পাঠিয়েছিলাম। পেয়েছ তো? তোমার মেয়ে কি আম পছন্দ করে? মেয়েকে আমার স্নেহাশিস দিও। তোমার স্কুলের চাকরি কেমন চলছে? শরীরের উপর বেশি চাপ পড়লে চাকরি ছেড়ে দাও। অবসর নাও। আমি যেমন অবসরজীবন যাপন করছি সেরকম অবসর। কাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। অবসরও কিন্তু এক ধরনের কাজ এবং বেশ জটিল কাজ।

আমার কথাই বলি— নিজের অবসরটা কীভাবে কাটাব তা নিয়ে আমাকে অনেক চিন্তাভাবনা করতে হয়। প্রতিদিন ঘুম ভাঙার পর চিন্তা করতে হয় আজকের দিনটা কীভাবে কাটাব। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। স্মৃতিশক্তি সমস্যা হচ্ছে। অনেক কিছু পুরোপুরি মনে করতে পারি না।

ভাল কথা, স্বপ্ন সম্পর্কে তুমি কি কিছু জান। নিজেকে মৃত স্বপ্নে দেখলে কী হয়? বাবুপারা এতিমখানার সুপার মুন্সি ইদরিস স্বপ্ন বিষয়ে অনেক কিছু জানতেন। কেউ কোনও কিছু স্বপ্ন দেখলেই বলে দিতেন, স্বপ্নের অর্থ কী! একবার আমি স্বপ্নে দশ- বারোটা সাপ দেখেছিলাম। আমি একটা ডোবার মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার চারদিকে সাপ কিলবিল করছে। স্যারকে স্বপ্নের কথা বলতেই তিনি বললেন— তোর কোনও বড় অসুখবিসুখ হবে। সত্যি সত্যিই আমার টাইফয়েড হয়েছিল।

চিঠি অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আর লম্বা করা ঠিক না। ভাল কথা, তোমাদের ওইদিকে কি বৃষ্টি পড়ছে? এদিকে ভাল বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হয় এ বছর বন্যা হবে।

তুমি ভাল থেকো।

মবিনুর রহমান

পুনশ্চ : মেয়েকে আমার স্নেহচুম্বন দিও।

লায়লাকে লেখা চিঠিতে সামান্য মিথ্যা বলা হল— এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে না, অথচ তিনি লিখেছেন বৃষ্টি হচ্ছে। চিঠি যদি সত্যি সত্যি লেখা হত তাহলে এই মিথ্যা তিনি ঠিক করতে পারতেন। যে চিঠি মনে মনে লেখা হয় সেই চিঠি ঠিক করা যায় না। মনের কোনও লেখাই নষ্ট করা যায় না। মস্তিষ্কের কোনও ইরেজ সিস্টেম নেই।

মবিনুর রহমান সিগারেট ধরালেন। মুন্সি ইদরিসকে চিঠি লেখার জন্যে তৈরি হলেন। এই চিঠি সাবধানে লিখতে হবে। এখানে ভুলভাল থাকলে চলবে না। সিগারেট টানতে টানতেও এই চিঠি লেখা যাবে না। এটা বেয়াদবি হবে। মবিনুর রহমান আধখাওয়া সিগারেট ফেলে দিলেন। চোখ বন্ধ করলেন। মুন্সি ইদরিসকে লেখার সময় চিঠির উপর সংখ্যায় লিখতে হবে ৭৮৬। এর অর্থ বিসমিল্লাহ হির রহমানুর রহিম। সম্বোধন হতে হবে পোশাকি—

৭৮৬

বড় হুজুর সমীপেষু

আসসালামু আলায়কুম।

দ্বিতীয় কোনও লাইন মাথায় আসছে না। এটা কেমন কথা? আর কিছু মাথায় আসছে না কেন? মবিনুর রহমান অস্থির বোধ করছেন। একটু আগে শীত শীত লাগছিল। এখন লাগছে না। তাঁর কপাল কি ঘামছে? তিনি চাদরের নিচ থেকে হাত বের করে কপালে রাখলেন। কপাল ঘামছে। তিনি ভীত গলায় ডাকলেন, বাবুল, বাবুল। ম্যানেজার।

বাবুর্চি গনি মিয়া বলল, স্যার কিছু লাগবে? বাবুর্চি গনি মিয়াকে তিনি চলে যেতে বলেছিলেন। সে যায়নি। এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়েছিল। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মুন্সি ইদরিসের সঙ্গে কেউ অপরাধ করলে তার শাস্তি হত। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে তাকে কানে ধরে উঠবোস করতে হত।

মুন্সি ইদরিস বলতেন, আমি কোনও অপরাধ ক্ষমা করি না। ক্ষমা করবেন আল্লাহপাক। তিনি রহমানুর রহিম। যে যত অপরাধই করুক ক্ষমা পেয়ে যাবে কারণ আল্লাহর রহমতের চেয়ে বেশি অপরাধ কেউ করতে পারবে না।

—গনি মিয়া।

—জ্বি স্যার।

—পানি খাব। পানি আন।

—স্যার এই নিন পানি।

—এই নিন পানি মানে? তুমি কি পানির গ্লাস হাতে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলে?

http://Doridro.com

ক্যাশিয়ার সাহেব বিরক্ত মুখে বেল টিপতে লাগলেন। এই কাজটা মনে হয় তিনি পছন্দ করেন না। অনেকক্ষণ বেল টেপার পর একজন ঘরে ঢুকল। সোবাহান সাহেব রাগী গলায় বললেন, বেলের শব্দ কানে যায় না? সব বারান্দায় বসে আছ। রঙ্গ দেখ? রঙ্গ গুহ্যদ্বার দিয়ে ঢুকায়ে দেব। গুহ্যদ্বার চিনো। যাও দুই কাপ চা আন।

শফিকুল করিম ক্ষীণ গলায় বলল, বারান্দায় কী হচ্ছে?

—কানে ধরে উঠবোস করানো হচ্ছে। আমাদের আগের ম্যানেজার। আমজাদ নাম। অপরাধ করেছিল, চাকরি চলে গেছে। স্যারের কাছে কেঁদে পড়েছে। স্যার বলেছেন পঞ্চাশ হাজার বার কানে ধরে উঠবোস করলে চাকরি ফেরত পাবে। তাই করছে।

—কতবার বললেন?

—পঞ্চাশ হাজার বার। ফিফটি থাউজেন্ড।

—বলেন কী?

—পারবে না। সাত দিন ধরে উঠবোস করছে মাত্র চৌদ্দশ না পনেরোশ হয়েছে। বেশিক্ষণ করতে পারে না। পা ফুলে যায়। তার উপর আছে হাঁপানি। আজকে উঠবোস করতে আসছে জ্বর নিয়ে। আমি বলেছিলাম আজকে অফ রাখতে।

শফিকুল করিম সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, এ রকম শাস্তি কি এখানে প্রায়ই হয়?

—না। এখানে কোনও শাস্তি হয় না। চাকরি চলে যায়। উঠবোস যেটা করছে সেটা চাকরি ফেরত পাওয়ার জন্যে। খামাখা পরিশ্রম করছে। পারবে না। আপনি কি চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন? বিসকিট, চানাচুর?

—জি না।

—রাতে কী থাকবেন না চলে যাবেন?

—চাকরির শর্ত কী? রাতেও থাকতে হবে?

—স্যার যে রকম বলেন সে রকম। তবে রাতে থাকেন বা না থাকেন এখানে আপনার জন্যে ঘর থাকবে। বিশ্রাম নিতে পারবেন। খাওয়াদাওয়া আমাদের সঙ্গে করবেন। স্টাফদের রান্না আলাদা হয়। বাবুর্চির রান্না খুবই ভাল। মাছ মাংস দুটাই থাকে। রাতে যদি রুটি খাওয়ার অভ্যাস থাকে বাবুর্চিকে আগে বলে দিবেন। রুমালি রুটি করে দেবে, মসলিন কাপড়ের মতো পাতলা।

—বাবুর্চির নাম কী?

—যাকে চায়ের কথা বললাম সেই বাবুর্চির নাম ছগির। ঢাকা শহরে ছগিরের মতো বাবুর্চি আছে বলে মনে হয় না। তার খাসির মাংসের রেজালা তুলনা বিহীন। চাকরিতে যখন ঢুকেছেন তখন তার রান্না অবশ্যই খাবেন। আমার কথা যাচাই করে নিতে পারবেন।

এক কাপের জায়গায় শফিকুল করিম দুকাপ চা শেষ করল। দুকাপ চায়ের সঙ্গে তিনটা সিগারেট। সোবাহান মিয়া সারাক্ষণই কথা বলে যেতে থাকলেন। তাঁর মনে হয় কথা বলার রোগ আছে।

—আপনি যে এসেছেন সেই খবর আমি মোবাইল টেলিফোনে স্যারকে দিয়ে দিচ্ছি। আপনি দোতলার বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকবেন। খবরের কাগজ টাগজ পড়বেন। স্যার যদি ম্যানেজার বলে ডাক দেন, তবেই ঘরে ঢুকবেন। না ডাকলে ঢুকবেন না।

—আমার পোস্টটা কী? ম্যানেজারের পোস্ট?

—এই রকমই কিছু ধরে নেন।

—আমজাদ সাহেব যিনি উঠবোস করছেন তিনি কি এই পোস্টেই ছিলেন?

—হ্যাঁ। আপনি উনার জায়গাতেই এসেছেন।

—আমজাদ সাহেবের শাস্তি শেষ হলে উনি চাকরি ফেরত পাবেন। তখন কি আমার চাকরি চলে যাবে?

—মনে হয় চলে যাবে। স্যার কখনও প্রয়োজনের বেশি স্টাফ রাখেন না। আপনি চলে যান দোতলায়। আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি। দুপুরে যখন খেতে আসবেন ঘরের চাবি নিয়ে যাবেন।

মবিনুর রহমান বসে আছেন তাঁর শোবার ঘরের একমাত্র চেয়ারটায়। এটা একটা রকিং চেয়ার। পা রাখার জন্যে ফুট-রেস্ট আছে। ফুট-রেস্টে পা রেখে চেয়ার যখন দোলানো হয় তখন ফুট-রেস্টটাও সমান তালে দোলে। আরামদায়ক ব্যবস্থা। তারপরেও তিনি কোনও আরাম পাচ্ছেন না। তিনি পিঠের পেছনে একটা বালিশ দিয়েছেন। বালিশটা দেওয়ার পর পর তাঁর মনে হয়েছিল এইবার আরাম হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে পিঠের পেছনে বালিশ দেওয়াটা বোকামি হয়েছে। বোকামি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ঠিক করতে হয় না। বোকামিটাকে প্রবাহিত হতে দিতে হয়। তিনি তাই করছেন, বোকামিটাকে প্রবাহিত হতে দিচ্ছেন।

তিনি চেয়ারে দুলতে দুলতে তাকিয়ে আছেন টিভি-র দিকে। তাঁর ঘরের টিভিটা বিশাল। ডায়াগোনালি পর্দার সাইজ ৬৪ ইঞ্চি। টিভির সঙ্গে দেওয়া হ্যান্ডবুকে লেখা আছে— পর্দার ছবি সবচেয়ে ভাল দেখার জন্যে দর্শককে পর্দা থেকে বিশ ফুট দূরে বসতে হবে। তিনি গজফিতা দিয়ে মেপে তাঁর রকিং চেয়ার ঠিক বিশ ফুট দূরে বসিয়েছেন। দোল খাওয়ার সময় চেয়ার একটু আগ-পিছ হয়। কতটুকু আগ-পিছ হয় সেটাও মাপিয়েছেন। ০.৩ ফুট। কাজেই তাঁর পজিশন ২০±০.৩ ফুট।

টিভিতে রান্না-বান্নার একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। ঝলমলে শাড়ি গয়না পরা অতি রূপবতী এক তরুণী পিজা বানাচ্ছে। তরুণীকে সাহায্য করছে আরও দুজন তরুণী। তিন জনের সাজসজ্জা এ রকম যে দেখে মনে হচ্ছে তারা কোনও বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেছে। কিছু দর্শকও উপস্থিত আছে। দর্শকরা শুধু যে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে তা-না। মাঝে মাঝে তাদের মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে যাচ্ছে। যেন এমন অপূর্ব দৃশ্য তারা তাদের মানব জীবনে কখনও দেখেনি। ভবিষ্যতে দেখবে এই সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী, পিজার জন্মভিটা ইটালি। তবে এই খাবার এখন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি বাংলাদেশেও। ঢাকা শহরে কতগুলি পিজা আউটলেট আছে আপনারা কি জানেন?

ক্যামেরা চলে গেল দর্শকদের মুখে। দর্শকরা চিন্তিত হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। একজন বলল, পঞ্চাশটি।

রাঁধুনি কপালে এসে পড়া চুলগুলি ঝাঁকি দিয়ে সরাতে সরাতে বলল, হয়নি। আর কেউ কি উত্তর দেবেন? যার উত্তর কাছাকাছি হবে তার জন্যে পুরস্কার আছে।

একশ।

তিনশ পঞ্চাশ।

এক হাজার।

তিনি টিভির ভ্যালুম একটু বাড়িয়ে দিলেন। ঢাকা শহরে কতগুলি পিজা আইটলেট আছে এটা জানা এই মুহূর্তে তাঁর কাছে জরুরি বলে মনে হচ্ছে। তিনি ঠিক করলেন এই ফাঁকে পিজা রান্নাটাও শিখে নেবেন। পিজা তাঁর কোনও পছন্দের খাবার না। তারপরেও নতুন একটা রান্না শিখে নিতে কোনও সমস্যা নেই। ইংরেজিতে একটা কথা আছে— Even an old can learn few new tricks.

মবিনুর রহমানের বয়স সাতান্ন। মাঝারি আকৃতির ছোটখাটো মানুষ। চেহারায় বয়সের ছাপ তেমনভাবে না পড়লেও মাথার চুল সবই শাদা। এই বয়সে মাথার চুল কমে যায়। কপাল বড় হয়। তাঁর বেলায় এই ঘটনা ঘটেনি। মাথা ভর্তি সাদা চুলের কারণে এবং গোঁফের কারণে তাঁকে অনেকটা আইনস্টাইনের মতো দেখায়। তিনি কলপ দেন না। কলপের কোনও একটা ইনগ্রেডিয়েন্টে তাঁর অ্যালার্জি আছে। দেশি-বিদেশি যে কলপই দেন তার গায়ে চাকা চাকা বের হয়।

মাথার সাদা চুল তাঁর পছন্দ না। বেশির ভাগ সময় তিনি মাথায় ক্যাপ পরে থাকেন। নানান ধরনের ক্যাপ তাঁর আছে। এখন তিনি যে ক্যাপ পরে আছেন সেটা আফগান মুজাহেদিন ক্যাপ। দেখতে অনেকটা কাগজের ঠোঙার মতো। একটা ভাঁজ দিয়ে মাথায় দিতে হয়। তাঁর পরনে লুঙ্গি গায়ে পাতলা ফতুয়া। তিনি টিভি পর্দা থেকে চোখ না সরিয়ে ডাকলেন, ম্যানেজার।

শফিকুল করিম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল। ঘরে ঢুকল না। দরজার ওপাশ থেকে ক্ষীণ গলায় বলল, স্যার ডেকেছেন?

http://Doridro.com

—জ্বি স্যার।

—কেন?

—আমার মনে হচ্ছিল আপনি পানি চাইবেন।

মবিনুর রহমান এক চুমুকে পানির গ্লাস শেষ করে গ্লাস ফেরত দিতে দিতে বললেন, গ্লাস হাতে ঘাপটি মেরে এতক্ষণ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকার কাজটা তুমি করেছ আমাকে চমকে দেবার জন্যে। তুমি ভেবেছ আমি চমকে যাব এবং খুশি হব। আমি চমক পছন্দ করি না। বায়েজীদ বোস্তামী তাঁর মা'র জন্যে পানির গ্লাস হাতে সারারাত জেগে ছিলেন। তুমি বায়োজীদ বোস্তামী না। তুমি বাবুর্চি' গনি মিয়া।

—স্যার আমার ভুল হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাই।

—আমি কাউকে ক্ষমা করি না। ক্ষমার মালিক আল্লাহপাক। তুমি তোমার ভুলের জন্যে কান ধরে দশবার উঠবোস কর।

গনি মিয়া উঠবোস করছে। তার কোমরে কিংবা হাঁটুতে বোধহয় কোনও সমস্যা আছে। এক একবার উঠবোস করছে কটকট শব্দ হচ্ছে।

—দশবার কি শেষ হয়েছে?

—জ্বি স্যার।

—কানে ধরে উঠবোস করানোর শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি আমি কার কাছ থেকে শিখেছি জান?

—জানি স্যার। আপনি বলেছিলেন মুন্সি ইদরিস।

—ঠিক বলেছ। আমরা তাঁকে বড় হুজুর ডাকতাম। অতি কঠিন লোক। কেউ অন্যায় করেছে আর তিনি তাঁকে শাস্তি দেন নাই এ রকম হয় নাই। একবার তাঁকে খুশি করার জন্যে এতিমখানার দারোয়ান বলল, বড় হুজুর আপনি ফেরেশতার মতো আদমি। বড় হুজুর বললেন, তুমি তো অন্যায় কথা বলেছ। সব মানুষের অবস্থান ফেরেশতার উপরে। তুমি আমাকে ফেরেশতার মতো বলে ছোট করেছ। পশ্চিম দিকে ফিরে কানে ধরে উঠবোস কর। উনি কেমন মানুষ ছিল বুঝতে পারছ গনি মিয়া?

—জ্বি স্যার।

সাত

শফিক কোয়ার্টার পেয়েছে।

আগার গাঁয়ের স্টাফ কোয়ার্টারের তিন নম্বর ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট দেখে মীরা হতভম্ব। শোবার ঘরই চারটা। মেঝেতে টাইলস বসানো। বাথরুম তিনটা। একটায় আবার বাথটাব আছে। রান্নাঘরটাও এত সুন্দর। কিচেন কেবিনেট ঝকঝক করছে। মাছ, তরকারি কোটার জন্যে টেবিলের মতো আছে। টেবিলটা মনে হয় মার্বেলের। মীরারর চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে চোখের পানি সামলাতে সামলাতে নিশোর দিকে তাকিয়ে বলল, বাসা পছন্দ হয়েছে মা?

নিশো বলল, আমাদের ফ্রিজ কোথায়?

মীরা বলল, ফ্রিজ কেনা হবে। যা যা দরকার সবই আস্তে আস্তে কেনা হবে।

নিশো বলল, আমরা কী বড়লোক হয়ে গেছি মা?

মীরা বলল, হ্যাঁ হয়েছি।

মনোয়ারা ফ্ল্যাট বাড়ির নানান খুঁত বের করলেন। যেমন একটা বাথরুমের কমোড পশ্চিম দিক করে বসানো। বারান্দা চিপা। রান্নাঘর দক্ষিণে। চুলার ধোয়া শোবার ঘরে ঢুকবে।

মীরা বলল, মা আপনার ফ্ল্যাট পছন্দ হয়নি?

মনোয়ারা বললেন, অন্যের বাড়ির আবার পছন্দ অপছন্দ কী। তুমি এরকম আহ্লাদী করছ যেন নিজের বাড়ি। এখন বল আমার ঘর কোনটা?

মীরা বলল, যে ঘরটা আপনার পছন্দ আপনি সেই ঘরেই থাকবেন।

—বারান্দাওয়ালা ঘরটা আমাকে দিও—। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে বারান্দায় বসব। আর শোন তোমার শ্বশুরের জন্যে আলাদা ঘর দাও। ইংরেজিওয়ালাকে নিয়ে এক ঘরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না।

মীরা দুদিনের মধ্যে ঘর সাজিয়ে ফেলল। জানালায় নতুন পর্দা। বাথরুমে শাওয়ার কার্টেন। বারান্দায় দড়িটানা চিক। শাশুড়ির নামাজের জন্যে নতুন জায়নামাজ। একটা দামী টিসেট কিনল। এক ডজন গ্লাস কিনল। ছটা প্লেট কিনল। এই বাড়িতে পুরানো কিছু মানাচ্ছে না। সব নতুন লাগবে। সব নতুন কেনার টাকা কোথায়?

দুটা খাট এবং একটা সোফাসেট দরকার। এইসব কেনা গেল না। মীরা ঠিক করে ফেলল যে ভাবেই হোক সামনের মাসে সে এই দুটা জিনিস কিনবেই। প্রয়োজনে গলার হারটা বিক্রি করবে। তার সব গয়না বিক্রি হয়ে গেছে। এই হারটা শুধু আছে। লুকানো আছে। শফিকও জানে না। জানলে অনেক আগেই বিক্রি হতো। ভাগ্যিস বিক্রি হয়নি। এখন কাজে লাগবে। মানুষ অভাবে পড়লে গয়না বিক্রি করে। সে বিক্রি করবে সুসময়ে।

নিশোর অনেক দিনের শখ মেটানোর জন্যে ইনস্টলমেন্টে একটা ফ্রিজ কেনা হয়েছে। নিশো সবাইকে বলছে, ফ্রিজটা আমার একার। ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি যদি কেউ খেতে চায় আগে আমাকে বলতে হবে। আমি পানি ঢেলে দেব। আমাকে না বলে কেউ ফ্রিজেও হাত দেবে না।

মীরার ধারণা, বাড়ি দেখে আনন্দে যে মানুষটা সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলতেন তিনি নিশোর দাদাজান। তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এক রাত ছেলের বাড়িতে কাটিয়ে ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে তিনি যে বের হয়েছেন আর বাড়িতে ফিরে আসেননি। আগের হোটেলেও যাননি। শফিক নানা জায়গায় তাকে খোঁজাখুঁজি করছে। কেউ কিছু বলতে পারছে না। এটা নিয়ে মনোয়ারা মোটেই চিন্তিত না। তিনি মীরাকে বলেছেন, তোমার শ্বশুর কোথায় আছে আমি জানি। তোমরা খামাখা অস্থির হয়ো না।

মীরা ভীত গলায় বলল, উনি কোথায় আছেন?

—হোটেলে থাকার সময় বাজারের কোনও মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তার বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

—আম্মা এইসব কী বলেন?

—পুরুষ জাতিকে আমি চিনি। তুমি চেন না। যেটা বললাম এটাই সত্যি। শফিককে নিষেধ করে দিবে খামাখা যেন ছোটাছুটি না করে।

—জ্বি আচ্ছা নিষেধ করব।

মীরা এই প্রথম তার নিজের সংসারের জন্যে কাজের মেয়ে রেখেছে। মেয়েটার নাম ফুলি। বয়স বার তেরো। প্রচুর কাজ করতে পারে। তাকে দিয়ে কাজ করানোর সময় মীরার একই সময় একটু লজ্জা লজ্জা লাগে আবার অহংকারও হয়। ফুলিকে সে মাঝে মাঝে উপদেশ দেয়। তখন নিজেকে অনেক বড় মনে হয়। মনে হয় তার অনেক ক্ষমতা।

—ফুলি শোন, মন দিয়ে কাজ করবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। অবসর সময়ে আমার শাশুড়ির সেবা করবে। তোমার কিসে ভাল হয় সেটা আমি দেখব। বিয়ের বয়স হোক ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেব। ঠিক আছে?

—জ্বি আম্মা ঠিক আছে।

—আমাকে আম্মা ডাকবে না। আমাকে ডাকবে আপা আর নিশোর বাবাকে ডাকবে ভাইজান। নিশোকে ডাকবে নিশো মামনি।

আগে মীরার দুপুরে ঘুমের অভ্যাস ছিল না। এখন ঘুমের অভ্যাস হয়েছে। রোজ দুপুরে ফ্যান ছেড়ে মেঝেতে পাটি পেতে সে কিছুক্ষণ ঘুমায়। সেই সময় ফুলি মাথায় তেল দিয়ে চুল টেনে দেয়। আরামে মীরার শরীর অবশ হয়ে আসে। মীরার মনে হয় তার মতো সুখি মেয়ে ঢাকা শহরে নেই।

এর মধ্যে একদিন মীরা বাথটাবে গোসল করেছে। সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতো স্নান। বাথটাব ভর্তি ফেনা মেশানো পানি। সে গলা ডুবিয়ে শুয়ে আছে। শরীর ফেনার নিচে রাখতে হচ্ছে কারণ সিনেমার নায়িকাদের মতো তার গায়েও কোনও কাপড় নেই। শুরুতে খুব লজ্জা লাগছিল। পরে আর লাগেনি। মীরা ঠিক করে রেখেছে, শাশুড়ি যেদিন থাকবেন না সেদিন শফিককে নিয়ে একসঙ্গে বাথটাবে গোসল করবে। সেদিন নিশোকেও বাড়িতে রাখা যাবে না। কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে। মেয়ে ভীষণ পাজি

http://Doridro.com

হয়েছে। সবাইকে বলে দেবে বাবা মা এক সঙ্গে গোসল করেছে। কাজের মেয়েটাকেও সেদিন বাসায় রাখা ঠিক হবে না।

একদিন মঞ্জু মামা এসেছিলেন ফ্ল্যাট দেখতে। তাঁকে ঠিকানা দেওয়া হয়নি। তিনি খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলেছেন। ফ্ল্যাট দেখে তিনি মুগ্ধ।

মীরা বলল, মামা এগুলি হচ্ছে কোম্পানির থার্ড ক্যাটাগরির ফ্ল্যাট। সেকেন্ড ক্যাটাগরিগুলি আরও অনেক সুন্দর। সব রুমে এসির ব্যবস্থা।

মঞ্জু মামা বললেন, তাহলে ফাস্ট ক্যাটাগরির ঘটনা কী? কারা থাকে সেখানে?

—কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার টাইপের অফিসাররা। ইন্ডিপেনডেন্ট বাড়ি। বাড়ির সামনে লন আছে। ফুলের বাগান আছে। ফুলের বাগানের জন্যে মালি আছে।

—বলিস কী? শফিক জেনারেল ম্যানেজার হবে কবে?

মীরা বলল, জানি না কবে হবে। যা হয়েছে এতেই আমি খুশি। আচ্ছা মামা সেকেন্ড হ্যান্ড এসি কোথায় পাওয়া যায়, কত দাম কিছু জান? ভাবছি একটা এসি লাগাব। ও গরমে ঘুমাতে পারে না। কষ্ট করে। অফিসে সারাদিন পরিশ্রম করে। রাতে ঘুম দরকার।

—এসি লাগাবি যখন নতুন লাগা। আমি খোঁজখবর করে দেখি কোন কোম্পানি ভাল।

মীরা গাঢ় গলায় বলল, দেখ খোঁজ নিয়ে।

—তোদের টেলিফোন আছে না? নাম্বার দে নিয়ে যাই।

—নাম্বার এখনও লাগায়নি মামা। এক সপ্তাহের মধ্যে লাগবে।

—বাথরুম কয়টা?

—তিনটা বাথরুম। বাথটাব আছে। হট ওয়াটারের সিস্টেম আছে।

কথাগুলি বলে মীরা কি যে আনন্দ পাচ্ছে। টাকা ধার করার জন্যে কতবার ওনার কাছে যেতে হয়েছে। একবার সে দুইগাছি সোনার চুড়ি নিয়ে গিয়েছিল। মঞ্জু মামা যদি কোথাও চুড়ি বন্ধক রেখে কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন। মামা চুড়ি রাখেননি। চুড়ি তার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। চুড়ি পরানোর সময় কি বিশ্রী ভাবেই না হাত ধরলেন। তখন মীরার ইচ্ছা করছিল মঞ্জু মামাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে। সে সরিয়ে দিতে পারেনি। তার টাকার দরকার ছিল। টাকা খুবই বড় জিনিস।

—মঞ্জু মামা।

—বল্।

—তুমি কিন্তু আজ দুপুরে খেয়ে যাবে। আমাদের নতুন কাজের মেয়ে ফুলি নাম। তার বয়স অল্প হলেও রাঁধে ভাল। কী খেতে চাও মামা বল। পোলাও রাঁধব?

—গরমের মধ্যে পোলাও করবে? আচ্ছা ঠিক আছে। তোর শ্বশুর শাশুড়িকে এখন কাছে এনে রাখ। বিরাট বাড়ি।

—বাবা মা তো আমাদের সঙ্গেই থাকেন। তাদের আলাদা ঘর আছে।

—তারা কোথায়?

—আমার শাশুড়ি নিউ মার্কেটে গেছেন নিশোকে নিয়ে। নিজে পছন্দ করে বিছানার চাদর কিনবেন।

—তোর শ্বশুর কই?

—উনি কোথায় জানি গিয়েছেন।

—বাসা খালি?

—কাজের মেয়েটা আছে।

মীরা লক্ষ্য করল মঞ্জু মামা এক দৃষ্টিতে তার নাভির দিকে তাকিয়ে আছেন। মীরা ঠিক করে ফেলল সে বাথরুমে ঢুকে শাড়িটা আরেকটু নিচে করে পরবে। যাতে মঞ্জু মামা ভাল মতো নাভি দেখতে পারেন। মীরা তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবে, যাতে মঞ্জু মামা তার পেটে হাত রাখতে পারেন। তখন মীরা কষে একটা চড় লাগাবে। চড় খাবার পর মামার মুখের ভাব

http://Doridro.com

কেমন হয় এটা মীরার অনেক দিনের দেখার শখ।

মঞ্জু মামা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তুই কাছে এসে বস গল্প করি। তোর শ্বশুর থাকলে ভাল হত। জমিয়ে গল্প করতে পারতাম। ইন্টারেস্টিং মানুষ।

গত চারদিন ধরে জয়নাল সাহেব নারায়ণগঞ্জে আছেন। লায়লার এক তলা বাড়ির ছাদের ঘরে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। তিনি আনন্দে আছেন। ছাদের ঘরটা বেঙ্গল হোটেলের ২৩ নম্বর ঘরের চেয়ে ছোট। জানালাও ছোট। তবে জানালা খুললে আকাশ দেখা যায়। তাঁর ঘরে কোনও সিলিং ফ্যান নেই। নীতু টেবিল ফ্যান ফিট করে দিয়েছে। নীতু লায়লার মেয়ে। জয়নাল সাহেবের ধারণা নীতুর মতো রূপবতী মেয়ে বাংলাদেশে আর একজনও নেই।

রূপবতীরা অহংকারী হয়। তিনি এই মেয়ের মধ্যে অহংকারের 'অ' এখন পর্যন্ত পাননি। তাঁর ধারণা এই মেয়েকে দশে দশ চোখ বন্ধ করে দেওয়া যায়। নীতু তাঁকে ডাকে ডিকশনারি চাচা। দিনের মধ্যে সে বেশ কয়েকবার ছাদে আসে। জয়নাল সাহেবের ঘরে টোকা দিয়ে বলে, ডিকশনারি চাচা দরজা খুলুন আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছি। এই মেয়ে ঝগড়া করার নানান অজুহাত নিয়ে আসে। জয়নাল সাহেবের বড়ই মজা লাগে। নীতুর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ ঝগড়া হয়েছে নীতুকে দশে দশ দেওয়া নিয়ে।

—ডিকশনারি চাচা আপনি আমাকে দশে যেন কত দিয়েছেন?

—দশে দশ।

—আমি ছাড়া আর কেউ কি আপনার কাছে দশে দশ পেয়েছে?

—শফিক পেয়েছে।

—শফিক কে?

—আমার ছেলে।

—নিজের ছেলে বলে দশে দশ দিয়ে ছিলেন।

—মাগো শফিক খুবই ভাল ছেলে।

—সব বাবা-মার কাছে নিজের ছেলে খুবই ভাল। যে ছেলে প্রতিদিন ফেনসিডিল খায় তার বাবাও বলে, আমার ছেলের ওই একটা দিক সামান্য খারাপ। ওইটা ছাড়া তার মতো ছেলে হয় না। ডিকশনারি চাচা, আপনার ছেলে কি ফেনসিডিল খায়?

—আরে না ফেনসিডিল খাবে কেন?

—অবশ্যই খায়। আপনি জানেন না। আপনার ছেলে তো আর আপনাকে জানিয়ে খাবে না। আসুন, লজিকে আসুন। আপনার ছেলে কি আপনাকে জানিয়ে ফেনসিডিল খাবে, মদ খাবে?

—তা খাবে না। তবে খেলে আমি টের পেতাম।

—কীভাবে টের পেতেন। আপনি তো ছেলের সঙ্গে থাকেন না। আপনি থাকেন হোটেলে। যে ছেলে বাবাকে হোটেলে ফেলে রাখে তাকে আপনি কীভাবে দশে দশ দেবেন।

—আমার ছেলে তো আমাকে হোটেলে ফেলে রাখে নাই। আমি নিজের ইচ্ছায় হোটেলে থাকি। যখন সে বড় বাসা নিবে তখন তার সঙ্গে থাকব।

—আপনার ছেলে কি হোটেলে প্রতি সপ্তায় আপনাকে দেখতে যেত?

—তা যেত না। কাজেকর্মে থাকে, প্রতি সপ্তাহে আসা তো সম্ভব না। মাসে এক- দু'বার করে আসত।

—অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা হোটেলে একা পড়ে থাকে তাকে দেখার জন্যে যে ছেলে আসে মাসে একবার তাকে কি দশে দশ দেওয়া যায়? ডিকশনারি চাচা আপনি তাকে নতুন করে নাম্বার দিন।

—তুমিই দাও গো মামা।

—আমি তাকে দিলাম দশে তিন। ফেল মার্ক। গ্রেস দিয়েও তাকে পাস করাতে পারবেন না। ঠিক আছে?

—ঠিক আছে।

—এখন আপনি নীচে আসুন। আমার এক বান্ধবী এসেছে রুমা নাম। তার সঙ্গে আমার একশো টাকা বাজি হয়েছে। সে দশটা কঠিন কঠিন ইংরেজি শব্দ লিখে এনেছে। আপনি যদি দশটা শব্দের মানে বলতে পারেন রুমা বাজিতে হারবে। আর যদি একটা মিস করেন আমি হারব। তখন আমাকে একশো টাকা দিতে হবে। সেই টাকা আমি দেব না। আপনি দেবেন।

—আমার কাছে একশো টাকা নাই গো মা।

—আপনি আপনার দশে তিন পাওয়া ছেলের কাছ থেকে এনে দেবেন। আপনি চাইলে সে আপনাকে একশো টাকা দেবে না?

—তা দিবে।

—তাহলে আসুন দেখি। আর শুনুন, রুমা বাজিতে হারলে যে একশো টাকা দেবে তার পুরোটাই আপনার।

—আমার টাকা লাগবে না মা।

—অবশ্যই লাগবে, আপনার হাত খালি না?

নীতুর সঙ্গে যতবারই তাঁর কথা হয় ততবারই মনে হয় যার সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে হবে সে হবে পৃথিবীর সৌভাগ্যবান পুরুষদের একজন। 'অতি রূপসীদের বিয়ে হয় না' সেই কারণে নীতুর বিয়ে নাও হতে পারে, এটা নিয়েও জয়নাল সাহেব চিন্তিত। এই মেয়েটির বিয়েতে তিনি উপস্থিত থাকতে চান এবং পুরনো দিনের মতো এক পাতার ছাপা উপহার দিতে চান। উপহার লেখা হবে ইংরেজিতে। তিনি নিজেই লিখবেন। কয়েকটা লাইন ইতিমধ্যেই মাথায় এসেছে—

An Angel was she
For her Greetings from me.
Her happy wedding today
And I want to say,
No one is like she.

নীতুর বিয়ে নিয়েই সমস্যা। এখানকার এক ওয়ার্ড কমিশনার নীতুকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। তার নাম লোকমান। সবার কাছে সে পরিচিত আঙুল কাটা লোকমান নামে। ছুরি চালাচালি করতে গিয়ে তার বাঁ হাতের দুটো আঙুল কাটা পড়েছে বলেই এই নাম। আগে সে আওয়ামি লিগের বিরাট কর্মী ছিল। বি এন পি ক্ষমতায় আসার পর কঠিন বি এন পি হয়েছে। বি এন পির টিকিটে ইলেকশন করে ওয়ার্ড কমিশনার হয়েছে।

আঙুল কাটা লোকমান লায়লার কাছে নিজেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে।

লায়লার পা ছুঁয়ে সালাম করে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলেছে—খালাম্মা আপনার মেয়েকে বিবাহ করতে চাই। কোনও জোর জবরদস্তি না। আপনার অনুমতি এবং দোয়া নিয়ে বিবাহ। আপনার মেয়ে সুন্দরী। তার প্রটেকশান দরকার। প্রটেকশান না দিলে দেখা যাবে কোনদিন কে মুখে অ্যাসিড মেরে দিয়েছে। আমি তখন আটকাতে পারব না। আপনাকে চিন্তাভাবনা করার সময় দিলাম খালাম্মা। ভালমতো চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিবেন। বিবাহের যাবতীয় খরচ আমার। মেয়ের নামে আমি একটা বাড়ি লেখাপড়া করে দিব। আপনিও মেয়ের সঙ্গে থাকবেন। এই আমার শেষ কথা। দশ দিন পরে আবার এসে আপনার সিদ্ধান্ত শুনব। যদি কোনও বেয়াদবি করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চাই। আঙুল কাটা লোকমান লায়লার পা ছুঁয়ে সালাম করে বিদায় হল।

দশ দিন পার হতে আর মাত্র তিন দিন বাকি। লায়লা ভেঙে পড়েছেন। নীতুর ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ। সে চব্বিশ ঘণ্টাই ঘরে থাকে।

জয়নাল সাহেব ঘটনা সবই শুনেছেন। তিনি যে লায়লাদের সঙ্গে থাকছেন তার প্রধান কারণ এটাই। একটা পরিবারকে এমন অসহায় অবস্থায় রেখে তিনি চলে যেতে পারেন না। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না যে এদের টাকা পয়সাও নেই। নীতুর বাবা মৃত্যুর আগে ধারদেনা করে শুধু এই বাড়ি বানিয়ে যেতে পেরেছেন। এই বাড়ি নিয়েও সমস্যা। একজন পুরনো দলিল বের করেছে। দলিলে দেখা যাচ্ছে যে- জমিতে এই বাড়ি সেই জমি তার। অন্যের জমিতে জবরদখল করে বাড়ি করা হয়েছে। এই নিয়ে কোর্টে মামলা চলছে। লায়লা একা কোর্ট-কাছারি করছেন। স্কুলে

http://Doridro.com

যাচ্ছেন। সপ্তাহে তিন দিন বাড়িতে ছাত্র পড়াচ্ছেন। তারপরেও দিন আনি খাই অবস্থা।

লায়লা জয়নাল সাহেবকে বলছেন, ডিকশনারি ভাই আপনি যে কয়েকদিন আমার এখানে আছেন তাতে আমার মেয়ে যেমন খুশি আমি তার চেয়েও খুশি। বুকে ভরসা হয় যে একজন কেউ মেয়েটার সঙ্গে আছে। স্কুলে যখন যাই সারাক্ষণ বুক ধড়ফড় করে—মেয়েটা বাসায় একা।

জয়নাল সাহেব বলেছেন, আপনি মেয়ের বিষয় নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবেন না। আমি সব ফয়সালা করে তারপর যাব। তার আগে না।

লায়লা বিস্মিত হয়ে বলেছেন, আপনি কিভাবে ফয়সালা করবেন?

জয়নাল সাহেব তৃপ্তির হাসি হেসে বলেছেন, ঢাকা সাউথের পুলিশ কমিশনার আমার ছাত্র। আমাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে। তার নাম মইন। তার স্ত্রীর নাম কেয়া। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে জিওগ্রাফিতে মাস্টার্স করেছে। তাদের একটাই ছেলে, ছেলের নাম টগর। সানবিম নামের একটা ইংরেজি স্কুলে পড়ে। অতি বুদ্ধিমান ছেলে। আমি শুধু মইনকে ঘটনাটা জানাব। আঙুল কাটা লোকমান পায়ে ধরে কূল পাবে না।

লায়লা হতাশ গলায় বলেছেন, পুলিশ এইসব ক্ষেত্রে কিছুই করে না।

জয়নাল সাহেব বলেছেন, আপনি ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দেন। দেখেন পুলিশ কিছু করে কিনা! আমি মইনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। সে ফেরত যাবে আঙুল কাটা লোকমানকে নিয়ে।

—আপনার কাছে পৃথিবীটা এত সহজ?

—সহজ তো অবশ্যই।

—আপনি ছাত্রের কাছে কবে যাবেন।

—যেতেও হবে না আমি টেলিফোন করলেই ঘটনা ঘটে যাবে। যে কোনও একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকান থেকে টেলিফোন করব তার দুই ঘন্টার মধ্যে দেখবে বাসার সামনে পুলিশের গাড়ি। মইনের টেলিফোন নম্বার আমার মুখস্থ। মোবাইল নম্বারও আছে আবার টি অ্যান্ড টির নম্বরও আছে।

—তাহলে দেরি করছেন কেন? টেলিফোনটা করে ফেলুন।

জয়নাল সাহেব টেলিফোন করেছিলেন। পুলিশ কমিশনার মইন টেলিফোন ধরেছেন। এবং শীতল গলায় বলেছেন, স্যার এইসব ঝামেলায় আপনি জড়াবেন না। আপনি কথা শুনুন, ঢাকায় চলে আসুন।

—ঢাকায় চলে আসব?

—অবশ্যই। আপনি বৃদ্ধ মানুষ আগ বাড়িয়ে ঝামেলায় যাবেন কেন?

—এদেরকে এইভাবে ফেলে রেখে চলে আসব?

—অবশ্যই।

—পুলিশ কিছুই করবে না। তাহলে তোমরা পুলিশরা আছ কী জন্যে?

—স্যার পুলিশ কী করবে না করবে সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্কে যাব না।

—তুমি আমার ছাত্র না হলে তোমাকে একটা খারাপ কথা বলতাম। ছাত্র এবং পুত্র এই দুই শ্রেণীকে কখনও কোনও খারাপ কথা বলা যায় না।

—আমাকে খারাপ কোনও কথা বললে যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে খারাপ কথা বলুন। শুধু দয়া করে আমার কথাটা শুনুন—ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসুন। আঙুল কাটা লোকমান ভয়ংকর সন্ত্রাসী। সে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

জয়নাল সাহেব লায়লাকে বলতে পারেননি যে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন। তবে তাঁর মাথায় অন্য একটা পরিকল্পনা এসেছে। মা মেয়ে দুজনকে ভুলিয়েভালিয়ে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া।

শফিকের বাসায় নিয়ে তুলবেন। ভয় মনোয়ারাকে নিয়ে। একবার যদি তার মুখ ছুটে যায় তাহলে সে কী বলবে না বলবে তার ঠিক নেই। আর একটা বুদ্ধি আছে— তার বড় মেয়ে সুরমার কাছে নিয়ে যাওয়া। সুরমা নাকি ভাল মেয়ে। বিপদগ্রস্ত একটা পরিবারকে সে দূরে ফেলে দেবে না।

জয়নাল সাহেব বাজির পরীক্ষা দিচ্ছেন। রুমা নামের মেয়েটা কঠিন কঠিন শব্দই কাগজে লিখে এনেছে। সে যাই আনুক কোনও সমস্যা জয়নাল সাহেবের নেই। সবই তাঁর মুখস্থ। তার পরেও এক একবার রুমা শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করে, তিনি চিন্তিত ভঙ্গি করেন। যেন শব্দের অর্থ তাঁর মনে পড়ছে না, এই কাজটা তিনি করছেন নীতু এবং তার মার জন্যে। তারা দুজনই টেনশানে মরে যাচ্ছে। মা মেয়ের দুজনের ভাব এরকম যেন তিনি শব্দের অর্থ না পারলে পরাজয়টা তাদের।

নটি শব্দের অর্থ বলা হয়েছে। দশ নম্বর শব্দ। এটা পারলেই রুমা বাজিতে হারবে। জয়নাল সাহেব লক্ষ করলেন টেনশানে মা মেয়ে দুজনই ঘামছে। তারা কি ধরেই নিয়েছে দশ নম্বর শব্দের অর্থ তিনি পারছেন না!

রুমা বলল, চাচা শেষ শব্দ— Garret।

জয়নাল সাহেব বললেন, মা Garret শব্দের মানে হল বাড়ির মাথায় ছোট্ট ঘর। চিলেকোঠা। আমি এখন যে ঘরে থাকি সেই ঘর। মা গো তুমি কি বাজিতে হেরেছ?

রুমা বলল, জ্বি চাচা।

নীতু এবং লায়লা দুজনের মুখেই বিজয়ীর হাসি। যেন দশটা শব্দের অর্থ মা মেয়ে দুজনে মিলেই দিয়েছে।

মবিনুর রহমান বারান্দায় বসে আছেন। শফিক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। সে অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছে। মবিনুর রহমান তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন কিন্তু কিছু বলছেন না। একবার শফিকের মনে হল স্যার বোধহয় ভুলে গেছেন যে শফিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শফিক বুঝতে পারছে না সে কি তার উপস্থিতি বোঝানোর জন্যে কোনও শব্দ করবে? স্যারের চোখ বন্ধ। এক একবার তিনি যখন চোখ বন্ধ রাখেন, অনেকক্ষণের জন্যে বন্ধ রাখেন।

মবিনুর রহমান বললেন, তোমার বাবার কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে বাবুল?

শফিক বলল, জ্বি না স্যার।

http://Doridro.com

—হোটেলে খোঁজ নিয়েছিলে?

—জ্বি স্যার।

—উনি কি মাঝে মাঝে উধাও হন।

—জ্বি কয়েকবার হয়েছেন।

—আমিও সে রকমই ভেবেছিলাম। তুমি যদি তোমার বাবার কোনও খোঁজ পাও তাঁকে বলবে যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন।

—জ্বি স্যার বলব।

—আমজাদ আলির শাস্তি কী বন্ধ আছে?

—স্যার ওনার শরীর খারাপ। পা ফুলে পানি এসে গেছে।

মবিনুর রহমান পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমজাদ তার শাস্তি শেষ করতে পারবে বলে মনে হয় না। ঢিমেতেতালায় উঠবোস করলে চলবে কীভাবে? দিনে একশোবার করে করলে তার লাগবে পাঁচশো দিন। প্রায় দেড় বছর। বাবুল হিসাব ঠিক আছে?

—জ্বি স্যার।

—আমজাদ আলিকে বলে দাও সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছি। চার মাস। তাকে চার মাসে শেষ করতে হবে। আজই তার বাসায় খবর পাঠিয়ে দেবে।

—জ্বি স্যার।

—তোমার সঙ্গে কাগজ কলম আছে?

—জ্বি স্যার আছে।

—এখন অন্য একটা হিসাব কর। যেসব কাজ আমি তোমাকে করতে বলেছি এবং তুমি করোনি তার তালিকা।

শফিক অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। বড় সাহেব তাকে কোনও কাজ দিয়েছেন, সে করেনি, এমন কিছু সে মনে করতে পারছে না।

মবিনুর রহমান বললেন, লেখ, এক নম্বর— তোমাকে ডাল রান্না করতে বলেছিলাম। করোনি।

—দুই নম্বর, করলা ভাজি নিয়ে একটা কথা বলেছিলাম। তুমি করলা ভাজি খাবে আমি দেখব। সেটা করোনি।

—তিন নম্বর, আমি বলেছিলাম তোমার মেয়ে নিশোকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তুমি আননি।

—চার নম্বর, লায়রার সঙ্গে যাতে যোগাযোগ রাখতে পার তার জন্যে তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে গাড়ি দিয়েছিলুম তুমি একবার মাত্র গিয়েছ। তাও সে যখন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। ঠিক বলেছি বাবুল?

—জ্বি স্যার।

—আমার কাজ করার জন্যে তুমি যে আনফিট তা কি বুঝতে পারছ?

শফিক চুপ করে আছে। মবিনুর রহমান আগের মতো মাথা দোলাচ্ছেন। হঠাৎ দোলানো বন্ধ করে বললেন, তুমি তোমার বাবার খোঁজ লায়লার কাছে পাবে বলে আমার ধারণা। লায়লা রান্না করে তাকে তরকারি পাঠিয়েছে। শিং মাছের ডিম। তোমার বাবা যেরকম মানুষ তিনি ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে অবশ্যই লায়লার কাছে যাবেন। আমি যদি শুনি তিনি লায়লার অতিথি হয়ে ওই বাড়িতেই বাস করছেন আমি মোটেই অবাক হব না।

শফিকের শরীর ঝিমঝিম করছে। সে নিশ্চিত এই অর্ধউন্মাদ মানুষ কানে ধরে উঠবোসের ব্যাপারটা তাকে দিয়েও করাতে চাইবে। এটা তার এক ধরনের খেলা। এই বৃদ্ধ তাকে নিয়ে অবশ্যই খেলতে চাইবে। তার জন্যে এটাই স্বাভাবিক।

—বাবুল।

—জ্বি স্যার।

—কোম্পানির ফ্ল্যাটে উঠেছ শুনলাম। ফ্ল্যাট পছন্দ হয়েছে?

—জ্বি স্যার।

—তোমার স্ত্রীর পছন্দ হয়েছে।

—জ্বি স্যার।

—তোমার স্ত্রীর নাম যেন কী?

—মীরা।

—ও হ্যাঁ মীরা। তোমার এবং তোমার কন্যার নাম মনে রাখার জন্যে একটা ব্যবস্থা করেছিলাম বলে তাদের নাম মনে আছে। তোমার স্ত্রীর নাম রাখার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি বলে তার নাম প্রতিবার জিজ্ঞেস করতে হয়। আচ্ছা বাবুল শোন, যারা আমার জন্যে কাজ করে আমি তাদের জন্যে অনেক কিছু করি। ঠিক না?

—জ্বি স্যার।

—কখনও কি ভেবেছ কেন করি?

শফিক চুপ করে রইল। মবিনুর রহমান শান্ত গলায় বললেন, আমার যেহেতু কেউ নেই— যারা আমার কাছে, তাদেরকেই আপনজন মনে করি। আমি মনে করি তাদেরকে নিয়েই আমার সংসার। এতিমখানায় যখন ছিলাম তখন এতিমখানার সবাইকে আমার সংসার মনে হত। এখন বুঝেছ?

—জ্বি স্যার।

—এতিমখানায় আমি একবার একটা বড় অন্যায় করেছিলাম। আমাদের বড় হুজুর মুন্সি ইদরিস আলি আমাকে দশ হাজার বার পশ্চিম দিকে ফিরে কানে ধরে উঠবোস করতে বললেন। সময় বেঁধে দিলেন— তিন দিন। আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখন কি হল জান? এতিমখানার সবাই এগিয়ে এল। তারা শাস্তি শেয়ার করবে। বড় হুজুর তাতে রাজি হয়েছিলেন। ইন্টারেস্টিং না?

—জ্বি স্যার।

তুমি ক্যাশিয়ার সোবাহানকে বল, আমজাদ আলির হয়ে অন্য কেউ যদি শাস্তি নিতে চায় আমি তাতে রাজি আছি। সেই ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ কমাতেও পারি। এখন তুমি আমার সামনে থেকে যাও। যাবার আগে সেলফোনটা দিয়ে যাও। একটা জরুরি টেলিফোন করব।

মবিনুর রহমান টেলিফোনে ফজলু নামের একজনকে ধরলেন। মবিনুর রহমান বললেন, ফজলু একটা কাজ করে দিতে হয় যে।

ফজলু বলল, স্যার কাজটা বলেন।

—আজ সন্ধ্যার মধ্যে একজনকে আমার সামনে উপস্থিত করবে। তার নাম লোকমান। লোকে ডাকে আঙুল কাটা লোকমান। নারায়ণগঞ্জের আঙুল কাটা লোকমান।

—স্যার আমি সন্ধ্যার আগেই তাকে উপস্থিত করব।

মবিনুর রহমান টেলিফোন রেখে দিলেন।

আট

জয়নাল সাহেবের মধ্যে জবুথবু ভাব চলে এসেছে। তিনি কুজো হয়ে মবিনুর রহমানের সামনে বসে আছেন। মবিনুর রহমান তাকিয়ে আছেন টিভির দিকে। টিভিতে নাচের দৃশ্য হচ্ছে। বিশ-পঁচিশটা মেয়ে নাচানাচি করছে। সবার হাতে সাদা ওড়না। শুধু একটি মেয়ের হাতে লাল ওড়না। সেই মেয়েটি মনে হয় নাচের দলের লিডার। তাকে ঘিরেই বাকি মেয়েগুলি নাচছে। টিভিতে কোনও শব্দ হচ্ছে না। জয়নাল সাহেব আড়চোখে মাঝেমধ্যে টিভির দিকে তাকাচ্ছেন। আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনছেন মবিনুর রহমানের দিকে। ঠাণ্ডা লেগে তাঁর কাশির ভাব হয়েছে। তিনি কাশতে পারছেন না। তাঁর মনে হচ্ছে কাশির শব্দে মবিনুর রহমান বিরক্ত হবেন। কাশি আটকাতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছে।

মবিনুর রহমান ঘাড় ফিরিয়ে জয়নাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাল আছেন?

জয়নাল সাহেব বললেন, জ্বি জনাব। তবে গতরাতে ঠাণ্ডা লেগে কফের মতো হয়েছে। এ ছাড়া ভাল আছি।

কথাগুলি বলে তিনি সামান্য সঙ্কুচিত হলেন। তাঁর জবুথবু ভাব আরও প্রবল হল। কারণ তিনি মিথ্যাভাষণ করেছেন। তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছে এটা সত্যি তবে তিনি ভাল আছেন এটা সত্যি না। তিনি ডিকশনারিটা হারিয়ে ফেলেছেন। দীর্ঘদিনের সঙ্গী হারিয়ে গেলে মন ভাল থাকে না।

http://Doridro.com

ডিকশনারিটা কোথায় হারিয়েছেন তিনি মনে করতে পারছেন না। নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসার পথে ডিকশনারি তাঁর হাতে ছিল এটা মনে আছে। তিনি ডিকশনারির পাতা উল্টোচ্ছেন এটাও মনে আছে। তখন একটা শব্দ চোখে পড়ল— Shoddy যার অর্থ Poor quality। শব্দটা পড়ে তিনি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন এই পর্যন্ত ঠিক আছে। বাস থেকে নামার পথে ডিকশনারি হাতে ছিল কিনা তা আর মনে পড়ছে না। বাস থেকে নেমে তিনি কী কী করেছেন ভাবতে শুরু করলেন। সময় কাটুক। কাশি চেপে বসে থাকা ছাড়া তো তাঁর এখন কিছু করার নেই।

বাস থেকে নেমে তিনি রিকশা করে পুলিশ কমিশনার সাহেবের বাড়িতে গেলেন। মইনের সঙ্গে দেখা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন তার স্ত্রী কেয়ার সঙ্গে কথা বলবেন। মেয়েদের মন নরম হয়। একটি মেয়েই অতি দ্রুত অন্য একটি মেয়ের সমস্যা ধরতে পারে। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন— নীতুর সমস্যাটা যতদূর সম্ভব গুছিয়ে কেয়াকে বলবেন। আঙুল কাটা লোকমান দশ দিন সময় দিয়েছিল। সেই দশ দিন আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। যা করার আজকের মধ্যেই করতে হবে। কেয়াকে সমস্যাটা ঠিকমতো বুঝিয়ে দিতে পারলে আর কিছুই লাগবে না। সে তার স্বামীকে চেপে ধরবে। পৃথিবীতে স্ত্রী জাতির ক্ষমতা স্বীকৃত। সিংহাসনে যিনি বসে থাকেন তিনি রাজ্য চালান না। রাজ্য চালান তাঁর স্ত্রী। মোঘল আমলই এর উদাহরণ আছে। সম্রাট জাহাঙ্গির সিংহাসনে বসে থাকতেন। সাম্রাজ্য চালাতেন তাঁর স্ত্রী নুরজাহান।

কেয়ার সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারলেন না। এই ব্যাপারটাও কিছু রহস্যময়। প্রথমে তাঁকে বলা হল, ম্যাডাম বাসায় আছেন। কী জন্যে এসেছেন। নাম কী? কেন দেখা করতে এসেছেন এটা আগে বলতে হবে। তিনি সবই বললেন। তখন তাকে গেটে দাঁড় করিয়ে রেখে পুলিশের গার্ড ভেতরে গেল এবং ফিরে এসে বলল, ম্যাডাম বাসায় নেই। আপনে পরে আসুন।

তিনি বললেন, পরে কখন আসব?

পুলিশ গার্ড বলল, সন্ধ্যার দিকে আসুন।

কেয়া কি ইচ্ছা করে দেখা করল না? এটা হতেই পারে না। তাঁর ধারণা পুলিশের গার্ড এখানে কোনও চাল চেলেছে। তার সঙ্গে তর্কে বিতর্কে না গিয়ে তিনি সন্ধ্যায় আবার যাবেন বলে ঠিক করে শফিকের বাসায় গেলেন। সেখানে গিয়ে শোনেন শফিক বাসা ছেড়ে দিয়েছে। নতুন বাসা নিয়েছে। সেই বাসার ঠিকানা বাড়িওয়ালা জানে না। তিনি শফিকের খোঁজে চলে এলেন মবিনুর রহমানের বাড়িতে। বাড়ির গেট দিয়ে ঢোকার সময় প্রথম লক্ষ করলেন হাতে ডিকশনারি নেই। তাঁর বুক ছ্যাঁত করে উঠল।

এই বাড়িতে ঢুকতে কোনও সমস্যা হয়নি। বাড়ির গার্ড তাঁকে সালাম দিয়ে ঢুকিয়ে গেট বন্ধ করে দিয়েছে। শফিকও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাছে এসে বলেছে, বাবা তুমি উপরে যাও। বড় সাহেব তোমার খোঁজ করছেন।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

শফিক বলল, কেন আমি জানি না।

তিনি বললেন, কোনও ঝামেলা হয়েছে নাকি?

শফিক বলল, কোনও ঝামেলা হয়নি।

তিনি বললেন, চারদিকে এত লোকজন কেন?

শফিক বলল, এখানে সব সময় প্রচুর লোকজন থাকে।

তিনি বললেন, বিরাট একটা ক্ষতি হয়েছে বুঝলি, ডিকশনারিটা হারিয়ে ফেলেছি।

শফিক বলল, ডিকশনারি হারিয়ে ফেলেছ আবার কিনে দেওয়া যাবে। তুমি বড় সাহেবের কাছে যাও। উনি খুব ব্যস্ত হয়ে তোমাকে খুঁজছেন।

ততক্ষণে তাঁর চোখে পড়ল বারান্দার এক কোনায় বয়স্ক চশমা পরা এক লোক কানে ধরে উঠবোস করছে। লোকটার চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম পড়ছে।

জয়নাল সাহেব ভীত গলায় বললেন, ওইখানে কী হচ্ছে?

শফিক বলল, শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

—কাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে?

—ওনার নাম আমজাদ আলি। বড় সাহেব ওনাকে কানে ধরে পঞ্চাশ হাজার বার উঠবোস করতে বলেছেন।

—বলিস কি? ওই বেচারার সঙ্গে কি কথা বলা যাবে?

—তাঁর সঙ্গে তোমার কথা বলার কিছু নেই বাবা।

—এক গ্লাস পানি খাবো। পানি খাওয়াতে পারবি?

—এসো আমার সঙ্গে পানি খাওয়াচ্ছি।

জয়নাল সাহেব বললেন, আমি এই কয়দিন কোথায় ছিলাম জানিস? শুনলে তুই অবাক হবি।

শফিক কিছু বলল না। এই ব্যাপারটাও জয়নাল সাহেবকে বিস্মিত করল। শফিক জানতেও চাচ্ছে না এই কয়দিন তিনি কোথায় ছিলেন। আশ্চর্য! শফিকের সঙ্গে নীতুর সমস্যাটা নিয়ে কথা বলা দরকার। কোনও বুদ্ধি কি সে দিতে পারবে না?

মবিনুর রহমান টিভির চ্যানেল বদলে দিলেন। এখন চলছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেল। পেঙ্গুইনদের কাণ্ডকারখানা দেখানো হচ্ছে। একটু আগে একদল মেয়ে নাচছিল এখন একদল পেঙ্গুইন নাচছে। কিংবা তারা হাঁটছে। হাঁটাই নাচের মতো লাগছে।

—জয়নাল সাহেব!

—জ্বি জনাব।

—আপনি কি আতরের গন্ধ পাচ্ছেন?

—জ্বি জনাব পাচ্ছি।

—আতরটার নাম মেশকে আম্বর। বাবুপুরা এতিমখানার প্রিন্সিপাল মুন্সি ইদরিস সাহেব এই আতর দিতেন। আমি কি ওনার কথা আপনাকে বলেছি?

—জ্বি না জনাব।

—আমি যে এতিমখানায় বড় হয়েছি এটা কি জানেন?

জয়নাল সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, জ্বি না জনাব।

—আমি বড় হয়েছি এতিমখানায়। এতিমখানা থেকেই ম্যাট্রিক পাস করি। ম্যাট্রিক পাস করার পর কারও এতিমখানায় থাকার নিয়ম নেই। বড় হুজুরের কঠিন নিয়ম যেদিন রেজাল্ট আউট হবে সেদিনই এতিমখানা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মবিনুর রহমান সাহেব কথা শেষ করার আগেই জয়নাল সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ম্যাট্রিকে আপনার কী রেজাল্ট ছিল জানতে পারি!

—আমি ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলাম দুটা লেটার।

—কোন দুই বিষয়ে লেটার পেয়েছিলেন?

—অঙ্কে পেয়েছিলাম আর ফিজিক্সে পেয়েছিলাম।

—ইংরেজিতে কত নাম্বার ছিল?

মবিনুর রহমান হেসে ফেলে বললেন, আমার মনে নেই। আপনি চাইলে মার্কশিট খুঁজে বের করতে পারি। বের করব?

—পরে দেখলেও চলবে। তবে দেখার ইচ্ছা হচ্ছে।

মবিনুর রহমান পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন, ডিকশনারি সাহেব আপনি কি সিগারেট খান?

জয়নাল সাহেব বললেন, জ্বি না। তবে আপনার সিগারেট নিশ্চয়ই খুব দামি। এক-দুইটা টান দিতে পারি। গতবার যখন এসেছিলাম তখন খেতে ইচ্ছা হয়েছিল লজ্জায় বলতে পারি নাই।

মবিনুর রহমান সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। নিজেই লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলেন। জয়নাল সাহেব এই ভদ্রতায় মোহিত হলেন।

মবিনুর রহমান বললেন, এখন আমার ইন্টারেস্টিং গল্পটা বলি। ম্যাট্রিকের রেজাল্টের পর আমি এতিমখানা ছেড়ে চলে যাব। বড় হুজুরের পা ছুঁয়ে সালাম করলাম, তিনি আমার হাতে একটা খাম দিলেন। তাঁর নিয়ম ছিল এতিমখানা ছেড়ে চলে যাবার সময় তিনি সবার হাতে একটা করে খাম দিতেন। খামে টাকা থাকত। তখনকার সময় হিসাবে টাকার পরিমাণ বেশ ভাল ছিল। পাঁচ হাজার। টাকাটা তিনি কিভাবে জোগাড়

http://Doridro.com

করতেন কে জানে! এতিমখানার আয় বলতে কিছু ছিল না। যাই হোক, আমি টাকাটা হাতে নিয়ে বললাম, বড় হুজুর আমার জন্যে একটু দোয়া করেন। আমার মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেন।

তিনি বললেন, যা ভাগ। আমি কারও জন্যে দোয়া করি না। নিজের দোয়া নিজে করবি।

—আমি বললাম, আপনার দোয়া না নিয়ে আমি যাব না।

—কী করবি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি?

—আমি বললাম, হ্যাঁ।

—কতদিন দাঁড়িয়ে থাকবি?

—আপনি দোয়া না করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকব। যতদিনই হোক।

—তিনি বললেন, এক শর্তে দোয়া করতে পারি। শর্ত তো তুই মানতে পারবি না।

—শর্ত মানব।

—তিনি বললেন, জীবনে কোনওদিন মিথ্যা বলতে পারবি না। মিথ্যা না বলা হল সুন্নতে রসুল। এই সুন্নত সারাজীবন পালন করতে হবে। পারবি?

—আমি বললাম, পারব।

—বড় হুজুর বললেন, পরের শর্তটা আরও কঠিন তবে প্রথম শর্ত পালন করতে পারলে পরেরটা সহজ হয়ে যায়। পরের শর্ত হল জীবনে কোনও অন্যায় করতে পারবি না।

—আমি বললাম, এটাও পারব।

—তিনি আমার মাথায় হাত রেখে চোখ বন্ধ করে দোয়া করলেন। দোয়া শেষ করে পাঞ্জাবির পকেট থেকে আতর বের করে তুলো দিয়ে আমার শার্টে খানিকটা লাগিয়ে বললেন, যা ভাগ। চরে খা।

—বড় হুজুরের এই পাঁচ হাজার টাকা দিয়েই আমার জীবনের অর্থবিত্তের শুরু। গল্পটা কী আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে?

—জ্বি জনাব। আপনার বড় হুজুর কী জীবিত আছেন?

—না। আমি এতিমখানা ছেড়ে চলে আসার পরের বছরই তিনি মারা যান।

জয়নাল সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন করার ছিল। প্রশ্ন করার সাহস হচ্ছে না।

মবিনুর রহমান বললেন, আপনার প্রশ্নটা আমি অনুমান করতে পারছি। আপনি জানতে চাচ্ছেন বড় হুজুরের শর্ত আমি পালন করতে পেরেছি কি না! তাই তো?

—জ্বি জনাব।

—আমি দুটা শর্তই পালন করতে পেরেছি। এখনও পারছি। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন?

—জ্বি করেছি।

—সিগারেট খেয়ে আপনি মনে হয় মজা পাচ্ছেন না। ফেলে দিন।

জয়নাল সাহেব সিগারেট ফেলে দিলেন। মবিনুর রহমান বললেন, আপনার পাঞ্জাবিতে কী একটু আতর লাগিয়ে দেব?

—আপনার ইচ্ছা হলে দিন।

মবিনুর রহমান পকেটের আতরের শিশি থেকে খানিকটা আতর জয়নাল সাহেবের পাঞ্জাবিতে লাগিয়ে দিতে দিতে বললেন, আপনি তো এই কয়দিন লায়লার বাড়িতে ছিলেন। আপনি কি জানেন লায়লার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল?

জয়নাল বিস্মিত হয়ে বললেন, জানি না তো?

—কেউ আপনাকে বলেনি?

—জ্বি না জনাব।

—খুব অল্প সময়ের বিয়ে। সাত ঘণ্টা সময়সীমা।

—জনাব আমি জানি না। আমাকে কেউ কিছু বলে নাই। ওনার সঙ্গে কি আপনার যোগাযোগ আছে?

—না যোগাযোগ নেই। অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা বড় হুজুর নিশ্চয়ই ক্ষমা করতেন না। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন এবং এই জাতীয় কোনও কিছু তাঁর কানে যেত তাহলে অবশ্যই আমাকে ডেকে বলতেন, পশ্চিম দিকে ফিরে কানে ধরে পঞ্চাশ হাজারবার উঠবোস কর। বলতেন না?

জয়নাল সাহেব কিছু বললেন না। বলার মতো কিছু তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। মবিনুর রহমান খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, তবে লায়লার সঙ্গে আমার একবার যোগাযোগ হয়েছিল। তার মেয়ের জন্মের পরপরই হঠাৎ একদিন আমাকে মেয়ের জন্মের সংবাদ দিল। এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে সে মেয়ের জন্যে আমার কাছে সুন্দর একটা নাম চাইল। আমার মাথায় তখন কোনও নাম নেই। যেটা মনে হল সেটাই বলে দিলাম।

জয়নাল সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, কী নাম দিলেন?

—আমি তার নাম দিলাম আতর।

জয়নাল সাহেব বললেন, ওর নাম নীতু। ভাল নাম শায়েরা হক।

মবিনুর রহমান বললেন, আমি জানি তার নাম নীতু এবং তার ভাল নাম শায়রা হক। আমার দেওয়া নাম লায়লার পছন্দ হয়নি। পছন্দ হবার কথাও না। আচ্ছা বলুন তো হঠাৎ লায়লা কেন আমার কাছে মেয়ের নাম চাইল?

—বলতে পারছি না জনাব।

—অনুমান করে বলুন।

—জনাব আমার অনুমান খুবই খারাপ। বুদ্ধিমান মানুষ ভাল অনুমান করতে পারে। আমি বোকা কিসিমের।

মবিনুর রহমান টিভির দিকে তাকিয়ে আবারও দুলতে শুরু করলেন। দুলতে দুলতেই চাপা গলায় বললেন, মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানেন? মাঝে মাঝে আমার মনে হয় লায়লার ওই মেয়েটির বাবা আমি। এই সত্যটি লায়লা তার স্বামীর কাছে গোপন করে গেছে। আমাদের বিয়ে অতি অল্প সময়ের জন্যে হলেও আমরা কিছুক্ষণ একসঙ্গে ছিলাম। আচ্ছা থাক এই প্রসঙ্গ।

জয়নাল সাহেব বললেন, আপনি কি ওনাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন না?

মবিনুর রহমান চেয়ারে দুলতে দুলতে বললেন, পারি না। একলা যখন থাকি প্রায়ই ভাবি লায়লার মেয়েটি আসলে আমার। ভাবলে খুবই আনন্দ হয়। আমি এই আনন্দ নিয়ে আছি, ভাল আছি। জিজ্ঞেস করে যখন জানব ঘটনা তা না, তখন কষ্ট পাব। খাল কেটে কষ্ট আনার দরকার কী! বলুন দরকার আছে?

—জ্বি না জনাব দরকার নেই।

মবিনুর রহমান বললেন, মুন্সি ইদরিস সাহেব আমার জীবন ছারখার করে গেছেন। আমি মোটেই সাধুসন্ত না। সারাজীবন সাধুসন্তের জীবনযাপন করে গেলাম। অনেকক্ষণ গল্প করলাম, এখন কাজের কথা সারি। আপনাকে আমি খুঁজছিলাম জরুরি কাজে।

—জ্বি জনাব বলুন।

—অনেক দিন থেকেই আমি বাবুপুরা এতিমখানা চালাচ্ছি। এতিমখানার বর্তমান প্রিন্সিপাল সাহেব অসুস্থ। হাসপাতালে আছেন। আমি একজন নতুন প্রিন্সিপাল খুঁজছি। যিনি বড় হুজুর মুন্সি ইদরিস সাহেবের মতো খাঁটি মানুষ।

জয়নাল সাহেব বললেন, এই জমানায় এমন মানুষ পাওয়া বড়ই কঠিন।

মবিনুর রহমান বললেন, কঠিন হবে কেন? ভাল মানুষ মন্দ মানুষ সব জমানাতেই থাকে। থাকে না?

—জ্বি থাকে।

—আপনার সন্ধানে কি কেউ আছে?

—জ্বি না জনাব।

মবিনুর রহমান বললেন, আপনি নিজেই তো আছেন। আপনি পারবেন না? ছাত্ররা আপনাকে ডাকবে ডিকশনারি হুজুর! এটা খারাপ কি?

জয়নাল সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন।

http://Doridro.com

মবিনুর রহমানের দৃষ্টি এখন টিভির দিকে। তিনি একটা হিন্দি চ্যানেল ধরেছেন। পুরনো দিনের কোনও একটা ছবি হচ্ছে। রাজা বাদশার ছবি। নর্তকী নাচছে। কুৎসিতদর্শন এক প্রৌঢ় মদের গ্লাস হাতে আধশোওয়া হয়ে নাচ দেখছে। ক্যামেরা এমনভাবে ধরা হয়েছে যে প্রৌঢ়ের মুখ দেখা যাচ্ছে নর্তকীর দু পায়ের মাঝখান দিয়ে। মবিনুর রহমানকে দেখে মনে হচ্ছে দৃশ্যটা দেখে তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

নয়

লায়লা সকাল থেকেই অপেক্ষা করছেন।

দরজার কড়া নড়ার শব্দ শোনার জন্যে অপেক্ষা। আগে দরজায় কলিংবেল দিল। বেল টিপলেই বেদিশি গানের সুর বাজত। এখন কলিংবেল নষ্ট। কেউ যদি বেল চাপে কোনও শব্দ হবে না। বাধ্য হয়ে তাকে কড়া নাড়তে হবে। লায়লা এই কড়া নাড়ার শব্দের জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

আঙুল কাটা লোকমানের দশ দিনের সময়সীমা শেষ হয়েছে। এখন সে যে কোনও সময় আসবে। লায়লা স্কুলে যাননি। মেয়েকে একা বাসায় ফেলে স্কুলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি চেয়েছিলেন মেয়েকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে। নীতু রাজি হয়নি। সে মাকে ফেলে যাবে না।

আজ সকাল থেকে লায়লার মনে হচ্ছে তিনি একটা বড় ধরনের ভুল করেছেন। তাঁর উচিত ছিল মেয়েকে সঙ্গে করে পালিয়ে যাওয়া। বাড়ির মায়া করা ঠিক হয়নি। তবে সেটাও সম্ভব হত না। আঙুল কাটা লোকমানের লোকজন তাঁদের উপর নজর রাখছে। তারা এটা হতে দিত না। লোকমানের সব লোকজনকে তিনি চেনেন না তবে একজনকে চেনেন। সে বেশির ভাগ সময় তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তার পাশে যে চায়ের দোকান, সেখানে বসে থাকে। একদিন তার সঙ্গে কথাও হয়েছে। সে পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে বলেছে, খালাম্মা কই যান? ইস্কুলে?

তিনি জবাব দেননি।

সে হাসিমুখে বলল, কিছু লাগলে বলবেন, আমি আছি।

তিনি বলেছিলেন, কিছু লাগবে না।

সে বলেছে, যখন দরকার হবে বলবেন। টাইম কোনও বিষয় না। আমি রাইতেও এই দোকানে থাকি। আওয়াজ দিলে চলে আসব। আমার নাম তুরা। নামটা মনে রাখেন খালাম্মা—তুরা।

তিনি বলেছিলেন, জানা থাকল।

বিপদে মানুষের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। তাঁর কি হয়েছে? হাতে দশ দিন সময় পেয়েছিলেন। এই দশ দিন কি তিনি নষ্ট করেননি?

দরকার কড়া নাড়ার শব্দ হচ্ছে। লায়লা শান্ত মুখে দরজা খুললেন। আঙুল কাটা লোকমান বা তার কোনও লোকজন না। শফিক দাঁড়িয়ে আছে।

লায়লা বললেন, কেমন আছ শফিক? শফিককে লায়লা সব সময় আপনি করে বলেন। আজ এই সময়ে তাকে দেখে এতই ভাল লাগছে যে তুমি করে বললেন।

শফিক বলল, ম্যাডাম ভাল আছি। আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি।

লায়লা বললেন, খবরটা কি দরজা থেকে দেবে না, ভেতরে ঢুকবে?

—খবরটা দিয়ে চলে যাব ম্যাডাম। আমার জরুরি কাজ আছে। তবে আপনি বললে ঘরে ঢুকব। যতক্ষণ থাকতে বলবেন, থাকব।

—খবরটা কী?

—স্যার আপনাকে বলতে বলেছেন, আঙুল কাটা লোকমান বিষয়ে আপনি যেন কোনও চিন্তা না করেন। তার ব্যবস্থা হয়েছে।

—কী ব্যবস্থা হয়েছে?

—সেটা তো ম্যাডাম আমি এখনও জানি না। তবে আমি দেখে এসেছি সে স্যারের বাড়ির বারান্দায় বসে আছে। ভয়ে তার কলিজা উড়ে গেছে।

—ও আচ্ছা।

—ম্যাডাম আমি কি কিছুক্ষণ থাকব না চলে যাব?

—এসেই যাই যাই করছ কেন? তোমার এমন কী জরুরি কাজ?

শফিক হাসিমুখে বলল, ম্যাডাম আমার কানে ধরে উঠবোস করার কাজ আছে। ঠিক করেছি একজনের শাস্তি ভাগাভাগি করব।

—তোমার কথা কিছু তো বুঝতে পারছি না।

—ম্যাডাম আরেকদিন এসে বুঝিয়ে দেব।

লায়লা মেয়ের খোঁজে ছাদে গেলেন।

নীতু ছাদে ফুলের টবে ফুল চাষ করে। সে গাছে পানি দিচ্ছিল। মাকে দেখে চোখ তুলে তাকাল।

লায়লা বললেন, আতর, ঘটনা কি হয়েছে শোন।

নীতু বিরক্ত গলায় বলল, মা তোমাকে অসংখ্যবার বলেছি এই কুৎসিত নামে আমাকে ডাকবে না। আতর কারও নাম হয়?

লায়লা বললেন, আচ্ছা যা আর ডাকব না।

নীতু বলল, সরি বল মা।

লায়লা বললেন, সরি।

লায়লা বললেন, সমস্যার সমাধান হয়েছে।

নীতু বলল, কে করল সমস্যার সমাধান! ডিকশনারি চাচা?

লায়লা জবাব দিলেন না। তিনি মুগ্ধ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন।

চৈত্র মাসের মেঘশূন্য আকাশের রোদ খুব কড়া হয়। সেই ঝাঁঝালো রোদ পড়েছে নীতুর গালে। গাল রোদে পুড়ে যাচ্ছে। কী সুন্দরীই না দেখাচ্ছে রৌদ্রময়ীকে!

অঙ্কন : সমীর সরকার

http://Doridro.com

তিনি বললেন, ভেতরে আসো। আমি যখন ডাকব আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে। দূরে দাঁড়াবে না। তোমার নাম যেন কী?

—শফিকুল করিম।

—এত বড় নাম তো আমার মনে থাকবে না। ছোট নাম আছে?

—আমাকে শফিক ডাকতে পারেন।

—শফিক ছাড়া আর কিছু? শফিক ডাকতে পারব না। শফিক নামে আমার একজন কর্মচারী ছিল বিরাট বদ। শফিক বলে ডাকলে তার কথা মনে পড়বে। আর কোনও নাম?

—বাবুল ডাকতে পারেন। আমার বাবা আমাকে বাবুল ডাকেন।

—নতুন নামে অভ্যস্ত হতে আমার সময় লাগে। যতদিন অভ্যস্ত না হব ম্যানেজার ডাকব। তোমার কোনও অসুবিধা নেই তো?

—না স্যার।

—কয়টা বাজে?

—দশটা পঁচিশ।

—এটা আমার একটা বদভ্যাস সময় জিজ্ঞেস করা। প্রায়ই সময় জিজ্ঞেস করব। তুমি বিরক্ত হয়ো না।

—বিরক্ত হব না স্যার।

—আকাশ খুব মেঘলা না?

—জ্বি স্যার।

—ঠিক আছে এখন যাও। বারান্দায় বসে থাকো। বৃষ্টি নামলে আমাকে খবর দিও। শোবার ঘর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা বোঝা যায় না।

—জ্বি আচ্ছা স্যার।

—তোমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রেসিপির মূল জায়গাটা মিস করেছি। টিভিতে পিজা রান্না শিখাচ্ছিল। তুমি রান্না বান্না কিছু জান?

—না।

—কোনও দিন রাঁধোনি? ভাত-ডাল-ডিম ভাজি?

—জ্বি না।

—বল কী? জীবনে কখনও রাঁধেনি এমন পুরুষ মানুষ পাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার। ছোটখাটো রান্না আমি নিজেও পারি। ডালটাতো খুব ভাল পারি। ডাল রান্নার আসল কৌশল জানো?

—না।

—সিদ্ধ করা, আর কিছু না। যত সিদ্ধ করবে ডাল ততই ভাল হবে। নরমাল সিদ্ধের চেয়ে প্রেসার কুকারের সিদ্ধ ভাল হয়। সিদ্ধ হয়ে যাবার পরের অংশটার নাম বাগার। হাঁড়িতে কিছু তেল নেবে। সেখানে পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি দিয়ে দেবে। পেঁয়াজ এবং রসুন কুচি যখন ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন সিদ্ধ ডাল দিয়ে দেবে। পরিমাণ মতো লবণ দেবে। কাঁচামরিচের গন্ধের জন্যে ফালাফালা কয়েকটা কাঁচামরিচ দিতে পার। কেউ কেউ পাঁচফোঁড়ন দেয়। পাঁচফোড়ন দিলে ডালে হিন্দু হিন্দু গন্ধ হয়ে যায় বলে আমি দিই না। এখন মনে হচ্ছে না ডাল রান্নাটা খুব সহজ?

—মনে হচ্ছে স্যার।

—এক কাজ করো আগামি কাল তুমি ডাল রান্না করো। দেখি কেমন হয়। মানুষের সব ধরনের ট্রেনিং থাকতে হয়।

—জ্বি স্যার।

—তোমার নাম বাবুল তাই না?

—জ্বি।

—এই দেখ তোমার নাম মনে আছে। তোমার নাম মনে রাখার জন্যে আমি সুন্দর একটা পদ্ধতি বের করেছি। এই পদ্ধতিকে বলে 'মেথড অব রাইম'। মিল পদ্ধতি। মনে মনে তোমার নাম দিয়ে একটা ছড়া বানিয়ে কয়েকবার বলেছি। ছড়াটা মাথায় ঢুকে গেছে। ছড়াটা হচ্ছে—

বাবুল
হাবুল
কাবুল।

এই পদ্ধতিতে তুমি যে কোনও মানুষের নাম মনে রাখতে পারবে। তারিখ মনে রাখার জন্যেও একটা পদ্ধতি আছে। তোমাকে শিখিয়ে দেব। আমার কাছে একটা বইও আছে 'রিমেমবারিং নেমস অ্যান্ড ডেটস'। পুরোটা পড়া হয়নি, কয়েক পাতা পড়েছিলাম। ইদানিং বই পড়ি না। আচ্ছা এখন যাও। অনেক কথা বলে ফেলেছি। বেশি কথা বলার অভ্যাস আগে ছিল না। ইদানিং হয়েছে। আমার বিছানার পাশে দেখ সিগারেটের প্যাকেট আছে, লাইটার আছে। আমাকে দিয়ে চলে যাও। আজ আর বৃষ্টিতে ভিজব না। তুমি ম্যারেড?

—জ্বি স্যার।

—বাচ্চা কাচ্চা আছে?

—একটা মেয়ে।

—বয়স কত?

—তিন বছর।

—নাম কী?

—নিশো।

নাম তো সুন্দর। নিশো। দাঁড়াও মনে রাখার ব্যবস্থা করি— নিশো, শিশু, যিশু। এই যে মাথায় নামটা ঢুকিয়ে দিলাম আর যাবে না। তোমার মেয়ের জন্যে আমার মাথার ভিতর একটা পার্মানেন্ট জায়গা হয়ে গেল।

শফিকুল করিম তাকিয়ে। কী বলবে বুঝতে পারছে না। বুড়োকে কার্টুনের মতো লাগছে। কথাবার্তাও কার্টুনের মতো। এই কার্টুন বুড়ো কোটি কোটি টাকা বানিয়ে ফেলেছে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। বুড়োর গা দিয়ে আতরের গন্ধ বের হচ্ছে। আতর মেখেছে নাকি? বাড়ির নাম আতর বলেই গায়ে আতর মেখে বসে থাকতে হবে!

মবিনুর রহমান কিছুক্ষণ দুলুনি বন্ধ রেখেছিলেন। আবার শুরু করলেন। তিনি টিভির দিকে চোখ ফেরালেন। পিজা রান্না শেষ হয়ে গেছে। দর্শকরা পিজা খাচ্ছে। দর্শকদের খাওয়া দেখে তাঁর নিজেরও খিদে লেগে গেল। অথচ কিছুক্ষণ আগেই তিনি দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিয়েছেন। আতপ চালের ভাত, মুরগীর ঝোল মাংস, আর একটা কী যেন আইটেম ছিল তাঁর মনে পড়ছে না। মনে করার চেষ্টা করতে হবে। আজকাল কিছুই মনে থাকছে না। খুব খারাপ লক্ষণ। বিস্মৃতি রোগ। ডাল কি ছিল? অবশ্যই ছিল। ডালের বাইরেও কি যেন ছিল। সবজি জাতীয় কিছু? নাকি আলুর চপ?

বাবুর্চিকে ডেকে জেনে নেওয়া যায়। এটা ঠিক হবে না। তাঁকেই বের করতে হবে।

শফিকুল করিম বারান্দায় বসে আছে। তাকে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে সে জানে না। এর মধ্যে যদি রাথরুম পায় সে কী করবে? একতলায় যাবে না কি দোতলাতেও তার মতো কর্মচারিদের জন্যে কিছু ব্যবস্থা আছে? বারান্দায় বসে সিগারেট নিশ্চয়ই খাওয়া যাবে না। পানির পিপাসা হলে কী করবে? দোতলায় কেউ কি আছে যার কাছে পানি চাওয়া যাবে? তার কাজ কি বড় সাহেবের দৃষ্টির আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকা? চাকরি ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয়! মীরাকে বলবে চাকরিতে জয়েন করার পর পরই বড় সাহেব বললেন, তোমাকে দিয়ে আমার হবে না। তুমি চলে যাও। আমার ম্যানেজারের কাছ থেকে তিন দিনের বেতন নিয়ে যাও। আমি বেতন নেইনি।

মীরা খুবই মন খারাপ করবে তার পরেও কিছুই হয়নি এমন ভাব করে বলবে, তিন দিনের বেতন না নিয়ে ভাল করেছ। তুমি ফকির নাকি?

সে বলবে, এখন চলবে কীভাবে?

মীরা বলবে, এত দুশ্চিন্তা করবে না। একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। তুমি তো মরুভূমিতে বসে নেই। তোমার টিউশনি আছে। কোচিং সেন্টারের পার্ট টাইম চাকরিটাও তো আছে।

—দিনে আনি দিনে খাই চলতেই থাকবে?

—চলুক। তুমি মুখ কালো করে থাকবে না। তোমার কালো মুখ দেখলে আমার খারাপ লাগে। চা বানিয়ে দিচ্ছি। চা খাও। তারপর চলো নিশোকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাই।

—কোথায় বেড়াবে? রিকশা ভাড়া লাগবে না!

http://Doridro.com

—রাস্তায় হাঁটব। রাস্তায় হাঁটতে তো আর টাকা লাগবে না!

—চলো হাঁটি।

চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকার সুবিধা হচ্ছে মনে মনে অনেক গল্প তৈরি করা যায়। গল্পকে নানান দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। শফিকুল করিম এখন রাস্তায় হাঁটার দৃশ্য কল্পনা করছে। নিশো মাঝখানে, তার দুই হাত বাবা মাকে ধরে রাখতে হচ্ছে। বাবা মা দুজনই যেন তার ভালবাসা সমানভাবে পায় এই বিষয়ে সে খুব হুঁশিয়ার। রিকশায় করে গেলে সে কিছুক্ষণ বসবে মার কোলে। কিছুক্ষণ বাবার কোলে। ভালবাসা ভাগাভাগির ব্যাপারে তার হিসাব পরিষ্কার।

কে একজন দূর থেকে তাকে দেখছে। সাদা প্যান্ট সাদা শার্ট। মাথায় সাদা ক্যাপ। বাবুর্চি নাকি? ইংরেজি কায়দায় 'শেফ'? শেফের পোশাক না পরে রাঁধতে পারে না এমন কেউ? তার অ্যাপ্রনের পকেটে কি থার্মোমিটার আছে? ডেকচিতে থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার দেখে নিল। খাতায় নোট রাখল—বড় সাহেবের জন্যে ইলিশ মাছের ঝোল রান্না করা হয়েছে এই তাপমাত্রায়। বাবুর্চির সঙ্গে কথা বলা দরকার। তার সঙ্গেই ডাল রাঁধতে হবে। রান্নাটা কি এই ফাঁকে সেরে নেবে? বাবুর্চির অবসর কখন সেটাও দেখতে হবে। বাবুর্চি যদি বলে বসে— এই পোশাকে তো রান্নাঘরে ঢুকতে পারবেন না। প্রপার ড্রেস লাগবে।

শফিকুল করিম এগিয়ে গেল। বাবুর্চি এক দৃষ্টিতে তার দিতে তাকিয়ে আছে। এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। বাবুর্চি শ্রেণী সবসময় রান্নার হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে বলে মানুষের দিকে চোখ তুলে কম তাকায়। এক দৃষ্টিতে তাকায় শুধু শিক্ষকশ্রেণী।

—স্যার স্লামালিকুম। আমার নাম গনি। আব্দুল গনি।

শফিকুল করিম বলল, কেমন আছ গনি?

—স্যার ভাল আছেন? অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে আছেন।

—বারান্দাতেই আমার বসে থাকার কথা।

—টিভি রুমে বসতে পারেন। লাইব্রেরি রুম আছে সেখানেও বসতে পারেন। চা নাশতা কিছু লাগলে আমাকে বলবেন।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

গনি নামের বাবুর্চিকে ভাল লাগছে। নম্র ভঙ্গিতে কথা বলছে, বাড়ি মনে হয় যশোহরের দিকে। ভাষা শুদ্ধ।

—আব্দুল গনি।

—জি স্যার।

—বড় সাহেব আমাকে ডাল রান্না করতে বলেছেন। উনি রেসিপি দিয়ে দিয়েছেন।

—আপনাকে কিছুই রান্না করতে হবে না। বড় স্যার কোনও কিছু মনে রাখতে পারেন না। আপনাকে একটা কথা বলে পাঁচ মিনিট পরেই ভুলে যাবেন।

—তাই না-কি?

—জি।

—এত বড় বাড়িতে উনি একা থাকেন?

—উনার সঙ্গে আমরা আছি। উনি একা। এতিমখানায় বড় হয়েছেন। বাবা-মা কে তাও জানেন না। টাকার পাহাড়ের উপর বসে আছেন। খরচ কে করবে তার নাই ঠিক। চা বানিয়ে দিই খান?

—দাও।

—আপনার মনে হয় সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে। লাইব্রেরি ঘরে বসে খান। স্যার লাইব্রেরি ঘরে কখনও আসেন না। উনি দিনরাত নিজের ঘরেই থাকেন মাঝেমধ্যে বারান্দায় এসে বসেন।

—তুমি সাহেবের সঙ্গে কত দিন আছ?

—প্রায় দশ বছর।

—উনি মানুষ কেমন?

—বড় মানুষদের যেসব আজেবাজে সমস্যা থাকে তাঁর এসব কিছুই নাই। অন্তত আমি দেখি নাই। মদ না, মেয়েমানুষ না। ভালমন্দ খেতেও পছন্দ করেন না। খামাখাই টাকা রোজগার করলেন। আপনাকে মনে হয় স্যার ডাকছেন। শুনে আসুন।

শফিকুল করিম অবাক হলে বলল, আমাকে কখন ডাকলেন? আমি তো কিছু শুনিনি।

—আমি শুনেছি। আমার কান পরিষ্কার।

দরজা ঠেলে বড় সাহেবের ঘরে ঢুকল। বুড়ো এখনও আগের জায়গাতেই আছে। টিভি চলছে। তবে বুড়োর চোখ বন্ধ।

—বাবুল!

—জি স্যার?

—কয়টা বাজে?

—সাড়ে এগারোটা।

—তার মানে তুমি প্রায় এক ঘণ্টা বারান্দায় বসেছিলে?

—জি স্যার।

—একজন যে কানে ধরে উঠবোস করছে এই দৃশ্য কি বারান্দা থেকে দেখা যায়?

—স্যার আমি লক্ষ করিনি।

—দেখা যাওয়ার কথা। এরা ঘটনাটা এমন জায়গায় করবে যেন আমি দোতলা থেকে দেখতে পারি।

শফিকুল করিম কিছু বলল না। কী বলবে সে? কী বললে বুড়ো খুশি হবে? চাকরি বজায় রাখতে হলে বুড়োকে খুশি রাখতে হবে। মাসে বারো হাজার টাকা বিরাট ব্যাপার। কিস্তিতে সে ফ্রিজ কিনতে পারে। ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি নিশোর খুবই শখের ব্যাপার। তার চেয়েও বড় ব্যাপার বুড়ো বাবাকে সঙ্গে এনে রাখা। যে বাবা তাকে বাবুল নামে ডাকেন। মাঝে মাঝে শুধুই বাবু। ল বাদ পড়ে যায়। বাবা তাকে যে নামে ডাকেন এই কার্টুন বুড়ো তাকে সেই নামে ডাকছে। এর চেয়ে কষ্টের আর কী হতে পারে! কার্টুনটাকে এই নাম বলা ঠিক হয়নি। বললেই হত তার নাম শামসু বা ফজলু।

—বাবুল!

—জি স্যার।

—দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো তোমার সঙ্গে কথা বলি।

এই ঘরে দ্বিতীয় কোনও চেয়ার নেই। বসতে হলে মেঝেতে বসতে হবে। এটাই বোধ হয় নিয়ম। বড় সাহেব সিংহাসনে বসে থাকবেন। সভাসদরা মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসবে।

—পঞ্চাশ হাজার বার কানে ধরে উঠবোসের শাস্তিটা তোমার কাছে কেমন লাগছে?

—অন্য রকম লাগছে স্যার।

—শাস্তির এই পদ্ধতি আমি শিখেছি বাবুপুরা এতিমখানায়। এতিমখানার প্রিন্সিপাল ছিলেন মুনশি ইদরিস। তিনি সবসময় গায়ে আতর মাখতেন। আতরের নাম মেশকে আম্বর। আমিও মাঝে মাঝে মাখি। কেউ কোনও অপরাধ করলেই মুনশি ইদরিস তাকে পশ্চিম দিকে ফিরে কানে ধরে উঠবোস করতে বলতেন। শাস্তির মাত্রার উপর কানে ধরে উঠবোসের সংখ্যা নির্ভর করত। এতিমখানার বাবুর্চিকে তিনি পঞ্চাশ হাজার বার কানে ধরে উঠবোসের শাস্তি দিয়েছিলেন। সে চেষ্টা করেছিল। সাত হাজার বার পর্যন্ত করেছিল। ইন্টারেস্টিং না?

—জি স্যার।

—বাবুর্চি কী অপরাধ করেছিল জানতে চাইলে না?

শফিকুল করিম চুপ করে রইল। তার মনে হচ্ছে সে একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলেছে। বাবুর্চি কী করেছিল জানতে চাওয়া প্রয়োজন ছিল। বুড়ো গল্প করতে চাইছে। তাকে গল্প চালিয়ে যেতে হলে শ্রোতার কাছ থেকে কিছু শুনতে হবে। তার কাজ কী? বুড়োর গল্প শোনা?

—বাবুল!

—জি স্যার।

—ঠিক আছে তুমি বারান্দায় থাক। প্রয়োজন হলে তোমাকে ডাকব।

—জি আচ্ছা।

—শুধু যদি ঝুম বৃষ্টি নামে— আমাকে খবর দেবে। পিটপিট বৃষ্টি হলে

http://Doridro.com

খবর দিতে হবে না।

—জি আচ্ছা।

—তোমার ডিউটি সকাল আটটা থেকে রাত আটটা। অসুবিধা আছে?

—জি না। স্যার আমার কাজটা কী যদি বলেন।

—বারান্দায় বসে থাকবে। বসে থাকাও কাজ। বেশ কঠিন কাজ। তবে তোমাকে আমি কাজ দেব। বিনা কাজে বেতন দেয়া আমার স্বভাব না। কাজটা তুমি পারবে কী পারবে না সেটা দেখারও ব্যাপার আছে। আমি তোমাকে পরীক্ষা করছি। ঠিক আছে তুমি এখন যাও।

শফিকুল করিম বারান্দায় বসে রইল। বড় সাহেব এর মধ্যে তাকে ডাকলেন না। দুপুরে নীচে গেল খাবারের জন্যে। খেতে পারল না। দু কাপ চা তিনটা সিগারেট টেনে আবারও বারান্দায় এসে বসে থাকল। বড় সাহেব তার পরীক্ষা নিচ্ছেন। এটা কীরকম পরীক্ষা? সে বারান্দায় বসে আছে। পরীক্ষক ঘরে বসে টিভি দেখছেন। রাত সাড়ে আটটায় বাবুর্চি গনি এসে বলল, এখন চলে যান। স্যার চলে যেতে বলেছেন।

শফিক বাসায় ফিরল একটা ইলিশ মাছ নিয়ে। রাত নটার পর নিউমার্কেট কাঁচাবাজারে হঠাৎ হঠাৎ মাছ খুব শস্তা হয়ে যায়। শফিকের হাতের মাঝারি সাইজের ইলিশটার দাম নিয়েছে মাত্র একশো টাকা। মাছটার পেটে ডিম আছে। খেতে তেমন স্বাদ হবে না। তবে ইলিশ মাছের ডিম মীরার অতি পছন্দের খাবার। কোনও এক বিচিত্র কারণে মেয়েরা পুরুষদের মতো খাদ্যরসিক হয় না। মীরাও হয়নি, শুধু ইলিশ মাছের ডিমের ঝোল হলে ভিন্ন কথা। এই সময় তার চোখ চকচক করে। মীরার কথা মনে করেই শফিককে সবসময় ডিমওয়ালা ইলিশ কিনতে হয়।

শফিকের হাত একেবারেই খালি। এই অবস্থায় একশো টাকা হুট করে খরচ করা যায় না। যে চাকরি শুরু করেছে তার উপর ভরসাও করা যাচ্ছে না। বড় সাহেব তাকে পরীক্ষা করছেন। পরীক্ষায় পাস করতে হবে। পাস করা যাবে কি-না তা সে জানে না। তার পরেও মাছটা কিনে তার ভাল লাগছে। মাছ দেখে মীরা খুশি হবে। বাসায় অনেক দিন মাছ-মাংস যাচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিনের মেনু আলুভাজি, ডাল ভাত। মাঝেমধ্যে নিশোর জন্যে একটা ডিম ভাজি। গত পরশু নিশোর ডিম ভাজির একটা অংশ মীরা শফিকের পাতে তুলে দিয়ে ভাল সমস্যা বাধিয়েছিল। শফিক খাওয়া বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে কঠিন গলায় বলল, এটা কেন করলে?

মীরা বলল, কী করলাম?

—নিশোর ডিমের অর্ধেকটা আমার পাতে তুলে দিলে কেন?

—তুমি খাবে এই জন্যে তুলে দিয়েছি। এমন তো না যে, তুমি ডিম খাও না।

শফিক গম্ভীর গলায় বলল, মীরা শোনো তুমি এই কাজটা করেছো আমাকে অপমান করার জন্যে। আমাকে তুমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছ যে আমি অপদার্থ শ্রেণীর একজন মানুষ। যে স্ত্রী-কন্যার জন্যে সামান্য খাবারও জোগাড় করতে পারে না।

মীরা বলল, শুধু শুধু চিৎকার কর না তো!

নিশোর স্বভাব হল, মায়ের প্রতিটি কথা তার নকল করতে হবে। নিশো তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা শুধু শুধু চিৎকার করবে না।

মীরা বলল, শান্ত হয়ে ভাত খাও।

নিশো বলল, বাবা খুব শান্ত হয়ে ভাত খাও।

শফিক শান্ত হয়েই খাওয়া শেষ করল, একবার শুধু বলল, মীরা শোন, মেয়েরা সবচেয়ে আনন্দ কখন পায় জান? সবচেয়ে আনন্দ পায় স্বামীকে অপমান করে। মেয়েদের কাছে এই আনন্দ সেক্সুয়াল প্লেজারের কাছাকাছি।

মীরা বলল, তথ্যটা জানা ছিল না। এখন জানলাম।

নিশো বলল, বাবা! মা এখন জেনেছে।

শফিক বাড়ির দরজায় ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টি যেন অপেক্ষা করছিল। শফিক দরজায় ধাক্কা দিল সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হল। একই সঙ্গে বৃষ্টি। হুড়মুড় টাইপ বৃষ্টি।

দরজা খুলে মীরা প্রথম কথা যেটা বলল সেটা হচ্ছে, এই তুমি তো গোসল করবে। বাথরুমে এক ফোঁটা পানি নেই। বৃষ্টিতে গোসল করে ফেল। করবে?

শফিক বলল, হুঁ।

মীরা বলল, তাহলে তাড়াতাড়ি কর। ঝুম বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকবে না।

—নিশো ঘুমুচ্ছে?

—হুঁ। তোমার জন্যে অনেকক্ষণ জেগেছিল। কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়েছে। ডেকে তুলব?

—না।

—মাছ কীভাবে রান্না করব? ভাজি করব না তরকারি?

—দুটাই করো।

—তরকারি কী দেব? ঘরে কচুমুখি আছে। মুখি তো আবার তুমি পছন্দ করো না।

—পছন্দ করি না, তাও না গলায় ধরে।

—কোনও তরকারি না হয় না দিলাম। শুধু ঝোল থাক।

—থাক।

শফিকের বাসায় বৃষ্টির পানিতে গোসলের ভাল ব্যবস্থা আছে। বারান্দার দক্ষিণ অংশে ছাদ থেকে গড়িয়ে আসা বৃষ্টি বড় ধারায় নেমে আসে। বাবুল গোসলে নেমেছে। গোসলের ফাঁকে ফাঁকে বাথরুমের প্লাস্টিকের বালতিগুলি পানিতে ভরে রাখছে। কাল সকালে মীরাকে পানি ধরতে হবে না।

মীরা মাছ কুটতে বারান্দায় এসেছে। মাছ কোটার চেয়ে সে বেশি আগ্রহ বোধ করছে স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে। মাছ এবং বঁটি নিয়ে সে বারান্দায় চলে এসেছে, সে বারান্দায় বসে মাছ কুটবে, স্বামীর সঙ্গে গল্প করবে। একটা ছোট্ট সমস্যা, বারান্দায় আলো নেই বললেই হয়। তবে ইলিশ মাছ কুটতে আলো লাগে না।

মীরা বলল, পানি ঠাণ্ডা?

শফিক বলল, বরফ গলা পানি। দেখ না ঠাণ্ডায় কাঁপছি।

—উঠে পড়।

—ঠাণ্ডা খারাপ লাগছে না।

—আজ তো প্রথম চাকরি করলে। বস কেমন?

—ইঁদুর টাইপ।

মীরা অবাক হয়ে বলল, ইঁদুর টাইপ মানে!

—ব্যাটাকে দেখে মনে হয় একটা শাদা ইঁদুর। লুঙ্গি ফতুয়া পরে মাথায় ক্যাপ দিয়ে চেয়ারে বসে দুলছে। শালা বুড়া ভাম।

—গালাগালি করছ কেন?

—বকর-বকর বকর-বকর করেই যাচ্ছে। গা থেকে বের হচ্ছে বেটিকা আতরের গন্ধ। একটা থাপ্পড় দিতে পারলে ...

—এরকম করে কথা বলবে না। প্লিজ। তোমার মুনিব, অন্নদাতা।

—হেন বিষয় নাই যে, সে কথা বলবে না।

—একা থাকে, কথা বলার লোক নেই। তোমার কাজটা কী?

—জানি না কাজ কী!

—আজ সারাদিন কী করলে?

—কিছুই করিনি। দোতলার বারান্দায় বসে ছিলাম। মাঝেমধ্যে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কয়টা বাজে? আরে ইঁদুর, তোর হাতে ঘড়ি আছে না? তুই ঘড়িতে দেখ কয়টা বাজে।

—একজন বয়স্ক মানুষ, তুই-তোকারি করছ কেন?

—মাথারও মনে হয় ঠিক নাই। উল্টাপাল্টা কথা— আমার নাম মনে থাকে না এই জন্যে নাম দিয়ে ছড়া বানিয়েছে।

—কী ছড়া?

বাবুল, হাবুল, কাবুল।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, বানিয়ে বানিয়ে এইসব কী বলছ?

—একটা কথাও বানানো না। বাবুল হাবুল কাবুল। ছড়াকার এসেছে!

http://Doridro.com

মীরা হাসছে। হাসি বন্ধ করার চেষ্টা করছে। পারছে না। শফিক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে গেল। মীরাকে মাঝে মাঝে খুবই সুন্দর লাগে। আজ লাগছে। আপন মনে হাসছে বলেই কি সুন্দর লাগছে! শফিক বলল, বুড়োর মুখটা ছোট কিন্তু বিশাল এক গোঁফ রেখে বসে আছে। মেথরদের মতো গোঁফ।

মীরা বলল, ওনার এত সমালোচনা করার দরকার নেই তুমি উঠে পড়। ঠাণ্ডা লাগবে।

—গায়ে সাবান দেব। সাবান এনে দাও। ঘরে সাবান আছে না?

—আছে।

মীরা সাবান এনে দিল। বাবুলের সাবান মাখা হল না। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। পানির ধারাস্রোত নেই। এখন টিপটিপ করে পানি পড়ছে। মীরা বলল, সাবান মাখতে চাইলে মাখ, বালতিতে পানি আছে তো।

শফিক বলল, পানি নষ্ট করব না। থাক।

মীরা বলল, তোমার বেতন কত ঠিক হয়েছে?

—বেতন খারাপ না।

—খারাপ না-টা কত বল শুনি।

—টুয়েলভ।

—টুয়েলভ মানে কী, বারো হাজার? সত্যি?

—ক্যাশিয়ার তো তাই বলল। আবার একটা মোবাইল টেলিফোনও নাকি দেবে। যাতে মোবাইলে যোগাযোগ থাকে। আমার লাইফ হেল করার বুদ্ধি। রাত তিনটার সময় টেলিফোন করে বলবে, বাবুল হাবুল কাবুল— কয়টা বাজে?

—তুমি দেখি ওনাকে একেবারেই পছন্দ করছ না।

—পছন্দটা করব কেন? আমার ইংরেজি সাহিত্যে একটা এম এ ডিগ্রি আছে। আমার চাকরিটা কী? একটা পয়সাওয়ালা ইঁদুরের প্রতিটি কথায় ইয়েস স্যার বলা। এই চাকরি তো আমি অবশ্যই করব না। চাকরি মানে তো শুধু টাকা না। এক ধরনের ফুলফিলমেন্ট থাকতে হবে। পারপাস থাকতে হবে। জব স্যাটিসফ্যাকশান থাকতে হবে।

—এ রকম চাকরি তো অনেক দিন ধরেই খুঁজলে কিছু তো পাওনি।

—তার মানে তো এই না যে, কোনওদিনও পাব না।

—যেদিন পাবে সেদিন এই চাকরি ছেড়ে দেবে।

—অবশ্যই ছেড়ে দেব এবং ইঁদুরটার গায়ে এক বোতল পানি ঢেলে চলে আসব। আমি ঠাট্টা করছি না। ওই কার্টুনের গায়ে আমি সত্যি পানি ঢালব।

মীরা বলল, কেন শুধু শুধু গালাগালি করছ। ওই প্রসঙ্গটা বাদ দাও না।

শফিক বলল, তোমার রান্না সারতে মনে হয় দেরি হবে। আমাকে এক কাপ চা দিও। শরীর ঠাণ্ডা মেরে গেছে। চাটা যেন কড়া হয়। তুমি পাতলা চা বানাও, খেতে ভাল লাগে না।

মীরা বলল, এখন চা খাওয়ার দরকার নেই। খিদে নষ্ট হবে। তুমি ঘড়ি ধরে বসে থাক আমি ঠিক কুড়ি মিনিটের মাথায় খাবার দেব।

শফিক বলল, চা দিতে বলেছি, চা দাও। আমার খিধা নষ্ট হবে কি, হবে না এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

মীরা বলল, মেজাজ খারাপ কেন?

শফিক বলল, মেজাজ ঠিক আছে। তুমিও দেখি বুড়োর মতো বেশি বেশি কথা বলছ। এত কথা বললে রান্নাটা করবে কখন?

শফিক খুবই তৃপ্তি করে খাচ্ছে। এত দ্রুত খাচ্ছে যে মীরার ভয় ভয় করছে। ভাত কম পড়ে যাবে না তো? এখন সে যদি বলে, আর-এক চামচ ভাত দাও— 'ঝোল দিয়ে খাব।' তাহলে মীরা ভাল বিপদে পড়বে। হাড়িতে কোনও ভাত নেই। তার নিজের প্লেটে আছে। শফিক যে মানুষ মীরা যদি নিজের প্লেট থেকে ভাত তুলে দেয় সে খাবে না।

মীরা বলল, মাছটা ফ্রেশ ছিল।

শফিক বলল, রান্না খুব ভাল হয়েছে। তুমি একদিন আমাকে ইলিশ মাছ রান্না শিখিয়ে দিও।

—তুমি রান্না শিখে কী করবে?

—বুড়ো যে-কোনও এক দিন বলে বসতে পারে, বাবুল হাবুল কাবুল ইলিশ মাছ রান্না কর।

—উনি খামাখা তোমাকে ইলিশ মাছ রান্না করতে বলবেন কেন? তুমি দেখি ভদ্রলোককে মাথা থেকে দূরই করতে পারছ না। ওনাকে মাথা থেকে অফ কর তো।

শফিক বলল, আচ্ছা যাও অফ করলাম। নিশো খেয়েছে?

—না একগাদা লিচু খেয়েছে। পেটে খিদা নেই।

—লিচু? লিচু এল কোত্থেকে?

—মঞ্জুমামা এনেছিলেন। রাজশাহীর লিচু। তুমি খাবে? এনে দেই?

—না।

—খাও না। খুব মিষ্টি। পোকা নেই। তুমি তো এই সিজনে লিচু খাওনি।

—বললাম তো, খাব না।

—তুমি না খেলে নাই। আমি খাব। এই শোন, আমি আর পাতের ভাত খেতে পারছি না। ভাত নষ্ট হবে। তোমার প্লেটে তুলে দেই?

শফিক কথা না বলে প্লেটেই হাত ধুয়ে ফেলল। বোঝাই যাচ্ছে সে খুব রেগেছে। রাগের কারণ মীরা খানিকটা ধরতে পারছে।

মীরা বলল, পান খাবে? পান দেই?

—পান কোথায় পেয়েছ?

—মঞ্জুমামা পান খেতে চাইলেন। দোকান থেকে কয়েক খিলি পান আনাতে বললেন। তোমার জন্যে দুই খিলি রেখে দিয়েছি। তুমি তো মাঝেমধ্যে পান খাও।

শফিক সিগারেট ধরাল। সে কঠিন চোখে মীরার দিকে তাকিয়ে আছে। মীরা বলল, এ রকম করে তাকিয়ে আছ কেন?

শফিক বলল, তুমি খাওয়া শেষ করো তোমাকে একটা কথা বলব।

http://Doridro.com

—আমার খাওয়া শেষ। কী বলতে চাও, বলো।

শফিক থমথমে গলায় বলল, তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, মঞ্জু নামের এই লোকটি যেন বাসায় না আসে।

—ওনাকে আমি মামা ডাকি।

—মামা, আংকেল এইসব আমাকে শিখাবে না।

মীরা বলল, উনি যদি বেড়াতে আসেন, আমি কী বলব? বলব, বাসা থেকে বের হয়ে যান?

—হ্যাঁ বলবে।

মীরা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, অতি তুচ্ছ জিনিসকে বড় করার তোমার অস্বাভাবিক এক ক্ষমতা আছে। তুমি লেখক হলে ভাল হত। তিলকে তাল করতে পারতে। মুখ ভোতা করে রাখবে না। পান খাও।

শফিক পান মুখে দিল।

মীরা বলল, আমি কি মঞ্জুমামার আনা লিচুর কয়েকটা খেতে পারি? না-কি তাও খাওয়া যাবে না। অনুমতি দিলে খেতে পারি।

—খাও।

—আর একটা কথা, রাতে তোমার কি আর কিছু লাগবে? লাগলে এখনই বলো। বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। তারপর ডেকে তুলবে, এর চেয়ে আগেই ফয়সালা হয়ে যাওয়া ভাল। লাগবে কিছু?

—হুঁ।

—সাজতে হবে? না-কি যেমন আছি তেমন থাকলেই হবে। তোমার মধ্যে এই এক অদ্ভুত জিনিস দেখলাম— বিশেষ প্রয়োজনের আগে সাজতে হবে। বাতি তো থাকে নেভানো। তুমি তো আর সাজটা দেখছ না!

—সব মানুষ তো এক রকম না। একেক জন মানুষ একেক রকম।

—তা ঠিক।

শফিক দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বলল, তোমার কথাবার্তায় গণ্ডগোল আছে। তুমি কী করে বললে, তোমার মধ্যে এই এক অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। তুমি তো একমাত্র আমাকেই দেখেছ। অন্য কারও সঙ্গে নিশ্চয়ই বিছানায় যাওনি!

—আমি একটা কথার কথা বলেছি।

—এরকম কথা দয়া করে আমাকে বলবে না। তোমার মঞ্জুমামাকে বলতে পার। আমাকে না।

—মঞ্জুমামার কথা এখানে এল কী জন্যে?

—আমি এনেছি তাই এসেছে।

মীরা ঘরের কাজ শেষ করে সাজতে বসল। সিল্কের শাড়ি পরল। ঠোঁটে লিপস্টিক দিল। চোখে কাজল দিল। সে আয়নায় নিজেকে দেখছে। কী সুন্দর মায়া মায়া একটা মুখ। এ রকম মায়া মায়া চেহারার একজন তরুণীর সঙ্গে তার স্বামী খারাপ ব্যবহার কী করে করে, তা মীরা বুঝতে পারছে না। তার মন খারাপ লাগছে।

শফিক খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। নিশো তার গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে ঘুমুচ্ছে। তবে তার ঘুমের ব্যাপারে কখনওই নিশ্চিত হওয়া যায় না। এই মেয়ে মাঝে মাঝে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। খুব অস্বস্তিকর সময়ে হঠাৎ উঠে বসে হতভম্ব গলায় বলে, বাবা তোমরা এসব কী করছ? তাদের একটাই শোবার ঘর। দুটো ঘর থাকলে ভাল হত। একটা ঘরে থাকত নিশো। নিশো তখন একা ঘুমাতো না। নিশোর সঙ্গে থাকতেন তার দাদু।

চাকরিটা যদি সত্যি সত্যি পার্মানেন্ট হয়ে যায় তাহলে সে অবশ্যই দুই শোবার ঘরওয়ালা একটা বাসা ভাড়া করবে। বাবা-মা দুজনকেই এনে সঙ্গে রাখবে।

চায়ের কাপ হাতে মীরা ঘরে ঢুকেই বলল, তোমার মেয়ে কী ঘুমুচ্ছে?

শফিক বলল, হ্যাঁ।

—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না। চোখ পিটপিট করছে।

শফিক কিছু বলল না, চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, চা-টা ভাল হয়েছে।

মীরা বলল, আমার সাজ কী তোমার পছন্দ হয়েছে?

—হুঁ।

—প্রথম যেদিন বেতন পাবে আমাকে সাজের কিছু জিনিস কিনে দিও। আমি আরও সুন্দর করে সাজব।

—আচ্ছা দেব।

—বাসাটা বদলাবে না?

—বদলাবো। বাবা মা'কে সঙ্গে এনে রাখব।

—আমি কি বাসা খোঁজা শুরু করব?

—তুমি কোথায় খুঁজবে?

—নিশোকে স্কুলে দিয়ে আমরা সব গার্জেনরা বাইরে বসে গল্পগুজব করি। তাদের মাধ্যমে অনেক খবর পাওয়া যায়। তুমি যদি বল, আমি কাল থেকেই বাসা খোঁজা শুরু করব।

—তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। চাকরি টিকবে কি-না এখনও জানি না। বুড়ো বলল, সে আমাকে পরীক্ষা করে দেখছে। পরীক্ষায় পাস করতে পারলেই চাকরি টিকবে।

—কী পরীক্ষা?

—জানি না কী পরীক্ষা। ঘুমুতে আস, বাতি নেভাও।

মীরা সুইচ বোর্ডে হাত দেবার আগেই নিশো বলল, মা এখন নেভাবে না। আমি ঘুমাইনি।

দুই

সকাল আটটা বাজে।

আমজাদ আলি আতর বাড়ির অফিস ঘরে চায়ের কাপ হাতে বসে আছেন। চা বিস্বাদ লাগছে। একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। সিগারেটে টান দিতেই মাথায় চক্কর দিল। বমি বমি ভাব হল। সবই শরীর খারাপের লক্ষণ। রাতে ভাল জ্বর এসেছিল। পা ফুলে ঢোল। তিনি তাঁর ছোট মেয়ে শায়লাকে পায়ে তেল মালিশ করতে বলেছিলেন।

শায়লা তেল মালিশ করতে এসে বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার পায়ে কি পানি এসেছে না-কি?

তিনি কিছু বললেন না, যদিও মেয়ের কাছে সত্যি কথাটা বলার ইচ্ছে একবার হয়েছিল। মেয়ে কথা রাখতে পারবে না। সবাইকে বলে বেড়াবে এই ভয়ে বলেননি।

তিনি কানে ধরে উঠবোস করছেন এই ঘটনা অবশ্যই চাপা থাকা দরকার। তাঁর তিন মেয়ের মধ্যে বড় দুটোর বিয়ে হয়েছে। ওদের কাছে খবর পৌঁছে গেলে বিরাট কেলেঙ্কারি হবে। শ্বশুরবাড়িতে মেয়ে দুটো অপমানিত হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। এই মহিলার মাথায় সামান্য গোলমাল আছে। রাগারাগি করে ঘুমের ওষুধ খাওয়া, সিলিং ফ্যানে শাড়ি ঝুলানো প্রায়ই করে। কানে ধরে উঠবোসের কথা শুনলে বিরাট কোন কেলেঙ্কারি অবশ্যই করবে।

—আমজাদ ভাইয়ের শরীর খারাপ নাকি?

ক্যাশিয়ার সোবাহান সাহেব কখন ঘরে ঢুকেছেন, কখন তাঁর চেয়ারে বসেছেন আমজাদ আলি তা মনে করতে পারলেন না। মনে হয় চায়ের কাপ হাতে নিয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি সোবাহান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু মনে হয় খারাপ। রাতে ঘুম হয় নাই। ভাবছি আজ উঠবোসটা করব না। রেস্ট নেব।

সোবাহান সাহেব বললেন, কিছুক্ষণের জন্যে করুন। স্যার আজ বারান্দায় বসেছেন। বারান্দা থেকে দেখবেন যে উঠবোস চলছে। স্যারের নজরে আসা দরকার না?

—অবশ্যই দরকার।

—সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে করেন। কোন টাইম লিমিট তো নাই।

—তা ঠিক।

—আমি সবাইকে কঠিনভাবে বলে দিয়েছি কেউ ভিড় করবে না। আর আপনার এত লজ্জা পাওয়ারও কিছু নাই। আগে পেটে ভাত তারপর লজ্জা। কী বলেন ঠিক বলছি না?

http://Doridro.com

—জ্বি।

—আমার ধারণা আরও কয়েক দিন পার হলে স্যার নিজ থেকেই বলবেন— আর লগাবে না। অপরাধ মাপ। সেই সম্ভাবনা আছে না?

—আছে।

—তাহলে দেরি না করে শুরু করে দিন। স্যার আবার ঘরে চলে যেতে পারেন। চা শেষ করে যান।

আমজাদ আলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, হিসাব কে রাখবে?

—আপনি বলবেন কত বার হয়েছে আমি লিখে রাখব।

—সেটা ঠিক হবে না। স্যার যদি দেখেন বারান্দায় আমি একা তাহলে ভাববেন কোনও দুই নম্বরী হচ্ছে। খাতা কলম নিয়ে কাউকে আমার সঙ্গে দিন।

—ঠিক বলেছেন। আমি ব্যবস্থা করছি।

আমজাদ আলি ওঠবোস শুরু করেছেন। প্রথম দিকে পায়ে টনটনে ব্যথা হচ্ছিল। এখন ব্যথা নেই। তবে হাতের কনুই কেন জানি ব্যথা করছে। মনে হচ্ছে দুই হাতেই কেউ দশ কেজি ওজনের দুটো পাথর ঝুলিয়ে দিয়েছে। বুকে এক ধরনের চাপ বোধ করছেন। এটা হাতের ব্যথার কাছে কিছু না।

সোবাহান সাহেবের ধমকে কাজ হয়েছে। আজ আর তাঁকে ঘিরে লোকজন দাঁড়িয়ে নেই। খাতা কলম নিয়ে বাজার সর্দার কুদ্দুস বসে আছে। কুদ্দুস মনে হচ্ছে লজ্জা পাচ্ছে। তার দিকে তাকাচ্ছে না। তিনি বললেন, কুদ্দুস ভাল আছ?

কুদ্দুস মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, জ্বি স্যার।

—বুড়ো বয়সে ভাল বিপদে পড়েছি তাই না কুদ্দুস?

—জ্বি স্যার।

—রোজ হাশরেও আমাদের সবার শাস্তি হবে। আল্লাহপাক স্বয়ং শাস্তি দিবেন। তবে সেই শাস্তিতে লজ্জা নাই। কারণ সেই শাস্তি অন্য কেউ দেখবে না। বেহেশ্‌তবাসী একজন আরেক জনকে চিনবে, কিন্তু দোজখবাসী কেউ কাউকে চিনবে না।

—স্যার কি একটু বিশ্রাম নিবেন?

—নাহ।

—তাহলে পানি খেয়ে নেন।

—আচ্ছা পানি নিয়ে আসো। পানি খাই। বুক শুকায়ে আসছে।

মবিনুর রহমান বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন।

এই বাড়ির বারান্দা পুরানো আমলের বারান্দার মতো। পনেরো হাত পাশের বিশাল বারান্দা। তাঁর চেয়ারটা দেয়াল ঘেঁষে। চেয়ারের সামনে বেতের টেবিল। তার পরেও সাত-আট হাত জায়গা আছে। ঢাকা শহরে যে বাড়ি সেই বাড়ির জন্যে এতবড় বারান্দার কোনওই প্রয়োজন নেই। বারান্দা থেকে দেখার কিছু নেই। দালান, দালান এবং দালান। শাদা দেওয়ালের দালান, হলুদ দেওয়ালের দালান, ইটের দালান।

তবে মবিনুর রহমানকে দালান দেখতে হয় না। দুটো কাঁঠাল গাছ, একটা আমগাছ এবং একটা কামরাঙ্গা গাছ তাঁর বারান্দা শহর থেকে আলাদা করে রেখেছে। বারান্দায় বসলে মনেই হয় না সামনেই দালানের সমুদ্র। বরং মনে হয় তিনি শহরের বাইরে কোথাও আছেন। সে রকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ কাঁঠাল গাছে দুটো পাখি বাসা বেঁধেছে। হলুদ রঙের পাখি, যার লেজটা লম্বা। বড় বড় শহরের গাছে হলুদ পাখি বাসা বাঁধে না। কাক বাসা বাঁধে।

সকাল এগারোটা। মবিনুর রহমানের সামনের টেবিলে দুটো বাংলা এবং একটা ইংরেজি পত্রিকা রাখা আছে। পত্রিকার পাশে মগ ভর্তি কফি। তিনি এখনও পত্রিকার ভাঁজ খোলেননি, কফিতেও চুমুক দেননি। সব দিন তাঁর পত্রিকা পড়তে ইচ্ছা করে না। যেদিন পত্রিকা পড়েন না সেদিন কফিতেও চুমুক দেন না। মানুষের সব কাজই একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত।

আজ তাঁর মন বেশ খারাপ। গত কাল দুপুরে মুরগির মাংসের ঝোলের সঙ্গে কী খেয়েছেন তা মনে করতে পেরেছিলেন। রাত বারোটার দিকে মনে পড়েছিল, এখন আর মনে পড়ছে না। বাবুর্চিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই হয়। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। তিনি ঠিক করেছেন আজ সারাদিনই মনে করার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তবে মনের উপর বেশি চাপ দেবেন না।

মবিনুর রহমান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ডাকলেন, বাবুল আসো এদিকে।

শফিক পাশের ঘর থেকে বের হয়ে এল।

মবিনুর রহমান টেবিলে পা তুলতে তুলতে বললেন, কয়টা বাজে বলো তো?

—স্যার এগারোটা বাজে।

—কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা না দু এক মিনিট এদিক-ওদিক আছে?

—এগারোটা তিন।

—তোমার এখান থেকে অফিস ঘরের বারান্দা দেখা যায়?

—জ্বি স্যার যায়।

—আমজাদ কি এখনও উঠবোস করছে?

—জ্বি না।

—তুমি একটা চেয়ার টেনে পাশে বসো।

শফিক চেয়ার টেনে পাশে বসল। তার অস্বস্তি লাগছে। বসের মুখোমুখি বসা যায়। পাশাপাশি কেন জানি বসা যায় না। মবিনুর রহমান বললেন, বাবুল তোমার কি কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে। না-কি তুমি টি ড্রিংকার?

—মাঝে-মধ্যে কফি খাই।

—তাহলে কফিটা খাও। আমি মুখে দেইনি।

—এখন ইচ্ছা করছে না স্যার।

—ইচ্ছা না করলে খেতে হবে না। আমি আমার নিজের ইচ্ছা অন্যের উপর চাপাতে খুবই অপছন্দ করি। কেন অপছন্দ করি বলো তো?

—বলতে পারছি না স্যার।

—আমার জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে অন্যের ইচ্ছায়। তিতা করলা আমার খুবই অপছন্দের একটা খাবার। আমার শৈশব কেটেছে তিতা করলা খেয়ে। করলার সিজনে বাবুপুরা এতিমখানায় তিতা করলা হবে না এটা হতেই পারে না। বাবুল, এখন কি করলার সিজন?

—জ্বি স্যার।

—তাহলে তো একবার করলা ভাজি করতে বলতে হয়। তুমি কি করলা ভাজি পছন্দ করো?

—জ্বি করি।

—ভেরি, গুড তাহলে আগামীকাল করলা ভাজি হবে। তুমি খাবে। আমি খাব না। আমি শুধু দেখব। ঠিক আছে বাবুল?

—জ্বি স্যার।

—লক্ষ করেছ, তোমার নাম আমার মনে আছে। ছড়াটা কাজে লেগেছে। তোমার মেয়ের নামও আমার মনে আছে। তোমার মেয়ের নাম নিশো। হয়েছে?

—জ্বি স্যার।

—নিশো কি করলা ভাজি খায়?

—বলতে পারছি না। আমি মনে করতে পারছি না।

—তোমার স্ত্রীর নাম কিন্তু আমার মনে থাকবে না, কারণ তার নাম নিয়ে আমি ছড়া বানাইনি। তোমার স্ত্রীর প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ল— আমি বিয়েও করেছিলাম অন্যের ইচ্ছায়। নিজের ইচ্ছায় না। খুবই ইন্টারেস্টিং গল্প। তোমাকে একদিন বলব। শুনলে মজা পাবে। তুমি চাইলে আজও বলতে পারি। বলব?

—আপনার বলতে ইচ্ছা করলে বলুন।

মবিনুর রহমান পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বললেন, আমি তোমাকে কোনও গল্প বললে সেটা মনে করে রাখবে। আমি যদি কখনও শুনতে চাই শুনাবে।

—জ্বি আচ্ছা স্যার।

http://Doridro.com